

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা'র গল্প

[illegible]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

টেনিদার গল্প

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫, জুন, ১৯৬৮। দ্বিতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, ডিসেম্বর ১৯৬৯ প্রকাশ করেছেন অমিয়কুমার চক্রবর্তী, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ছেপেছেন জগন্নাথ পান, শান্তিনাথ প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৬। প্রচ্ছদ এঁকেছেন গণেশ বসু। ভিতরের ছবি, শৈল চক্রবর্তী।

৫'০০

পটলডাঙার চার মূর্তির লীডার টেনিদাকে চেনে না এমন কিশোর বাংলা দেশে নেই বললেই চলে। সেই টেনিদাকে কেন্দ্র করে লেখা প্রায় সমস্ত গল্পগুলো এই গ্রন্থে প্রকাশিত হল।

হৈ-হুল্লোড়ে ভরা এই বই ছোটরা লুফে নেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

—প্রকাশক



কাঁচুমাচু করে বলে ফেললাম, এই—কেত্তন শুনছিলাম।

—কেত্তন শুনছিলে? ইয়ার্কি পেয়েছ? এই বেলা তিনটের সময় শেয়ালদার মোড়ে দাঁড়িয়ে কী কেত্তন শুনছিলে? আমি দেখি নি চাঁদ, এক্ষুনি দ্বারিকের দোকান থেকে মুখ চাটতে চাটতে বেরিয়ে এলে?

এই সর্বনাশ—ধরে ফেলেছে তো! গেছি এবারে! দুর্গানাম জপতে শুরু করে দিয়েছি ততক্ষণে, কিন্তু কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম কে জানে, ফাঁড়াটা কেটে গেল! না চটে টেনিদা গোটা ত্রিশেক দাঁতের ঝলক দেখিয়ে দিলে আমাকে। মানে—হাসল।

—ভয় নেই—আমাকে খাওয়াতে হবে না। শ্যামলালের ঘাড় ভেঙে দেলখোশে আজ বেশ মেরে দিয়েছি। পেটে আর জায়গা নেই।

আহা বেচারা শ্যামলাল! আমার সহানুভূতি হল। কিন্তু আমাকে বাঁচিয়েছে আজকে। দধীচির মতো আত্মদান করে আমার প্রাণ,—মানে, পকেট বাঁচিয়েছে।

টেনিদা বললে, এখন আমার সঙ্গে চল্ দেখি!

সভয়ে বললাম, কোথায়?

—চোরাবাজারে। খাট কিনব একখানা—শুনেছি শস্তায় পাওয়া যায়।

—কিন্তু আমার যে কাজ—

—রেখে দে তোর কাজ! আমার খাট কেনা হচ্ছে না, তোর আবার কাজ কিসের রে? ভারি যে কাজের লোক হয়ে উঠেছিস—অ্যাঁ?—কথাটার সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো একটা রদ্দা আমার পিঠে এসে পড়ল।

বাঃ—কী চমৎকার যুক্তি! টেনিদার খাট কেনা না হলে

আমার কোনো আর কাজ থাকতে নেই! কিন্তু প্রতিবাদ করবে কে? সূচনাতেই যে রদ্দা পিঠে পড়েছে, তাতেই হাড়-পাঁজরাগুলো ঝনঝন করে উঠেছে আমার। আর একটি কথা বললেই সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তি অসম্ভব নয়।

—চল্ চল্।

না চলে উপায় কী। প্রাণের চেয়ে দামী জিনিস সংসারে আর কী আছে?

চলতে চলতে টেনিদা বললে, তোকে একদিন পোলাও খাওয়াতে হবে। আমাদের জয়নগরের খাসা গোপালভোগ চাল—একবার খেলে জীবনে আর ভুলতে পারবি না।

কথাটা আজ পাঁচ বছর ধরে শুনে আসছি। কাজ আদায় করে নেবার মতলব থাকলেই টেনিদা প্রতিশ্রুতি দেয় আমাকে গোপালভোগ চালের পোলাও খাওয়াবে। কিন্তু কাজটা মিটে গেলেই কথাটা আর টেনিদার মনে থাকে না। গোপালভোগ চালের পোলাও এ পর্যন্ত স্বপ্নেই দেখে আসছি—রসনায় তার রস পাবার সুযোগ ঘটল না।

বললাম, সে তো আজ পাঁচশো বার খাওয়ালে টেনিদা!

টেনিদা লজ্জা পেলে বোধহয়। বললে, না, না—এবারে দেখিস। মুশকিল কী জানিস—কয়লা পাওয়া যায় না—এ পাওয়া যায় না—সে পাওয়া যায় না!

পোলাও রাঁধতে কয়লা পাওয়া যায় না! গোপালভোগ চাল কী ব্যাপার জানি না, তা সেদ্ধ করতে ক-মণ কয়লা লাগে তাও জানি না। কিন্তু কয়লার অভাবে পোলাও রান্না বন্ধ আছে এমন কথা কে শুনেছে? আমাদের বাসাতেও তো পোলাও মাঝে মাঝে হয়, কই র‍্যাশনের কয়লার জন্যে তাতে তো

অসুবিধা হয় না! হাইকোর্ট দেখানো আর কাকে বলে! ওর চাইতে সোজা বলে দাও না বাপু—খাওয়াব না! এমনভাবে মিথ্যে মিথ্যে আশা দিয়ে রাখার দরকার কী?

টেনিদা বললে, ভালো একটা খাট যদি কিনে দিতে পারিস, তাহলে তোর কপালে পলান্ন নাচছে এ বলে দিলাম।

—পলান্ন!

—হ্যাঁ—মানে পোলাও! তোদের বুক্‌ড়ি চালের পোলাওকে কি আর পলান্ন বলে নাকি! হয় গোপালভোগ চাল, তবে না —হুঁঃ!

হায় গোপালভোগ! আমি নিশ্বাস ছাড়লাম।

তারপর খাট কেনার পর্ব।

টেনিদা বললে, এমন একটা খাট চাই যা দেখে পাড়ার লোক স্তম্ভিত হয়ে যাবে! বলবে, হ্যাঁ—একটা জিনিস বটে! বাংলা নড়বড়ে খাট নয়—একেবারে খাঁটি সংস্কৃত খট্টা—যার পায়াকে বলে খট্টাঙ্গ। শুনলেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চমকে উঠবে।

কিন্তু এমন একটা খট্টাঙ্গ-ওলা খট্টা কিনতে গিয়েই বিপত্তি!

একেবারে বাঁশবনে ডোমকানা! গায়ে গায়ে অজস্র ফার্নিচারের দোকান। টেবিল, চেয়ার, সোফা, আলনা, আয়না, পালঙ্কের একেবারে সমারোহ। কোন্ দোকানে যাই?

চারদিক থেকে সে কী সম্বর্ধনার ঘটা! যেন এরা এতক্ষণ ধরে আমাদেরই প্রতীক্ষায় দস্তুরমতো তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে বসে ছিল।

—এই যে স্যার—আসুন—আসুন—

—কী লইবেন স্যার, লইবেন কী? আয়েন, আয়েন, একবার দেইখ্যাই যান্—

—একবার দেখুন না স্যার—যা চান ! চেয়ার, টেবিল, সোফা, খাট, বাক্স, ডেস্কো, টিপয়, আলনা, আয়না, র‍্যাক, ওয়েস্ট-পেপার বাস্‌কেট, লেটার বক্স—

লোকটা যেভাবে মুখে ফেনা তুলে বলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল একেবারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল পর্যন্ত বলে তবে থামবে।

টেনিদা বললে, দুত্তোর—এ যে মহা জ্বালাতনে পড়লাম !

উপদেশ দিয়ে বললাম, চট্‌পট্‌ যেখানে হয় ঢুকে পড়ো, নইলে এর পরে হাত-পা ধরে টানতে শুরু করে দেবে !

তার বড় বাকিও ছিল না। অতএব দু-জনে একেবারে সোজা দমদম বুলেটের মতো সেঁধিয়ে গেলাম—সামনে যে দোকানটা ছিল তারই ভেতরে।

—কী চান দাদা, কী চাই ?

—একখানা ভালো খাট।

—মানে পালং ? দেখুন না, এই তো কত রয়েছে। যেটা পছন্দ হয়। ওরে ন্যাপলা, বাবুদের জন্যে চা আন, সিগারেট নিয়ে আয়—

—মাপ করবেন, চা-সিগারেট দরকার নেই। এক পেয়ালা চা খাওয়ালে খাটের দরে তার পাঁচগুণ আদায় করে নেবেন তো ? আমরা পটলডাঙার ছেলে মশাই, ওসব চালাকি বুঝতে পারি। বাঙাল পান নি—হুঁ !

দোকানদার বোকার মতো তাকিয়ে রইল। তারপর সামলে নিয়ে বললে, না খান তো না খাবেন মশাই—ব্যবসার বদনাম করবেন না।

—না, করবেন না ! ভারি ব্যবসা—চোরাবাজার মানেই তো

চুঁরির আখড়া। চা সিগরেট খাইয়ে আরো ভালো করে পকেট মারবার মতলব !

মিশকালো দোকানদার চটে বেগুনী হয়ে গেল ঃ ইঃ, ভারি আমার ব্রাহ্মণ-ভোজনের বামুন রে ! ওঁকে চা না খাওয়ালে আমার আর একাদশীর পারণ হবে না ! যান যান মশাই—অমন খদ্দের ঢের দেখেছি !

—আমিও তোমার মতো ঢের দোকানদার দেখেছি—যাও—যাও—

এইরে—মারামারি বাধায় বুঝি ! প্রাণ উড়ে গেল আমার। টেনিদাকে টেনে দোকান থেকে বার করে নিয়ে এলাম।

টেনিদা বাইরে বেরিয়ে বললে, ব্যাটা চোর !

বললাম, নিঃসন্দেহে। কিন্তু এখানে আর দাঁড়িও না, চলো অন্য দোকান দেখি।

অনেক অভ্যর্থনা এড়িয়ে আর অনেকটা এগিয়ে আর একখানা দোকানে ঢোকা গেল। দোকানদার একগাল হেসে বললে, আসুন—আসুন—পায়ের ধুলো দিয়ে ধন্য করুন ! এ তো আপনাদেরই দোকান !

—আমাদের দোকান হলে কি আর আপনি এখানে বসে থাকতেন মশাই ? কোন্ কালে বার করে দিতাম, তারপর যা ইচ্ছে হয় বিনি পয়সায় বাড়িতে নিয়ে যেতাম।

এ দোকানদারের মেজাজ ভালো—চটল না। একমুখ পান নিয়ে বাধিত হাসি হাসবার চেষ্টা করলে ঃ হেঁঃ—হঁঃ—হেঁঃ। মশাই রসিক লোক ! তা নেবেন কী ?

—একখানা ভালো খাট।

—এই দেখুন না। একখানা প্লেন, এখানাতে কাজ করা।

এটা বোম্বাই প্যাটার্ন, এটা লণ্ডন প্যাটার্ন, এটা ডি-লুক্স প্যাটার্ন, এটা মানে-না-মানা প্যাটার্ন—

—থামুন, থামুন! থাকি মশাই পটলডাঙা স্ট্রীটে—অত দিল্লী-বোম্বাই-কাম্‌চাটকা প্যাটার্ন দিয়ে আমার কী হবে! এই এখানার দাম কত?

—ওখানা? তা ওর দাম খুবই শস্তা। মাত্র সাড়ে তিনশো।

সা—ড়ে তিনশো?—টেনিদার চোখ কপালে উঠল।

—হ্যাঁ—সাড়ে তিনশো। এক ভদ্দরলোক পাঁচশো টাকা নিয়ে ঝুলোঝুলি পরশু—তাঁকে দিই নি।

—কেন দেন নি?

—আমার এসব রয়্যাল খাট মশাই—যাকে তাকে বিক্রী করব? তাতে খাটের অমর্যাদা হয় যে! আপনাকে দেখেই চিনেছি—বনিয়াদী লোক। তাই মাত্র সাড়ে তিনশোয় ছেড়ে দিচ্ছি—আপনি খাটের যত্ন-আত্তি করবেন।

আহা—লোকটার কী অন্তর্দৃষ্টি! ঠিক খদ্দের চিনেছে তো! আমার শ্রদ্ধা বোধ হল। কিন্তু টেনিদা বশীভূত হবার পাত্র নয়।

—যান—যান মশাই, এই খাটের দাম সাড়ে তিনশো টাকা হয় কখনো? চালাকি পেয়েছেন? কী ঘোড়ার ডিম কাঠ আছে এতে?

বলতে বলতেই খাটের পায়া ধরে এক টান—আর সঙ্গে সঙ্গেই মড়্-মড়্-মড়াৎ! মানে খাটের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি।

—হায়—হায়—হায়—

দোকানদার হাহাকার করে উঠল: আমার পাঁচশো টাকা দামের জিনিস মশাই, দিলেন সাবাড় করে? টাকা ফেলুন এখন!

—টাকা! টাকা একেবারে গাছ থেকে পাকা আমের মতো

টুপটুপ করে পড়ে, তাই না? খাট তো নয়—দেশলাইয়ের বাক্স, তার আবার দাম!

দোকানদার এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। খপ করে টেনিদার ঘাড় চেপে ধরেছে ঃ টাকা ফেলুন—নইলে পুলিশ ডাকব!

বেচারা দোকানদার—টেনিদাকে চেনে না। সঙ্গে সঙ্গে যুযুৎসুর এক প্যাঁচে তিনহাত দূরে ছিটকে চলে গেল। পড়ল একটা টেবিলের ওপর—সেখান থেকে নিচের একরাশ ফুলদানীর গায়ে। ঝন-ঝন করে দু-তিনটে ফুলদানীর সঙ্গে সঙ্গে গয়াপ্রাপ্তি হয়ে গেল—খণ্ডপ্রলয় দস্তুরমতো।

দোকানদারের আর্তনাদ—হৈ-হৈ হট্টগোল। মুহূর্তে টেনিদা পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলেছে আমাকে, তারপর বিদ্যুৎবেগে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বৌ-বাজার স্ট্রীটে। আর বেমালুম ঘুসি চালিয়ে ফ্ল্যাট করে ফেলেছে গোটাতিনেক লোককে। তার পরেই তেমনি স্লিৎসৃক্রীগ করে সোজা লাফিয়ে উঠে পড়েছে একখানা হাওড়ার ট্রামে। যেন ম্যাজিক!

পেছনের গণ্ডগোল যখন বৌবাজার স্ট্রীটে এসে পৌঁছেছে, ততক্ষণে আমরা ওয়েলিংটন স্ট্রীট পেরিয়ে গেছি।

আমি তখনো নিশ্বাস ফেলতে পারছি না। উঃ—একটু হলেই গিয়েছিলাম আর কি! অতগুলো লোক একবার কায়দা মতো পাকড়াও করতে পারলেই হয়ে গিয়েছিল, পিটিয়ে একেবারে পরোটা বানিয়ে দিত!

টেনিদা বললে, যত সব জোচ্চোর! দিয়েছি ঠাণ্ডা করে ব্যাটাদের!

আমি আর বলব কী! হাঁ করে কাতলা মাছের মতো দম নিচ্ছি তখনো। বহু ভাগ্যি যে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষে পেল আজকে!

ট্রাম চীনেবাজারের মোড়ে আসতেই টেনিদা বললে, নাম্—নাম্!

—এখানে আবার কী?

—আয় না তুই।···বলতে বলতেই এক ঝটকায় উড়ে পড়েছি ফুটপাথে।

টেনিদা বললে, চীনেদের কাছে শস্তায় ভালো জিনিস মিলতে পারে। আয় দেখি।

বাঙালীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি, আবার চীনেম্যানের পাল্লায়! নাঃ, প্রাণটা নিয়ে আর বাড়ি ফিরতে পারব মনে হচ্ছে না! প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে নিতান্তই পটল তুলল আজকে! কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম—হায় হায়!

সভয়ে বললাম, আজ না-হয়—

—চল্ চল্—ঘাড়ে আবার একটি ছোট রদ্দা।

কঁ্যাক্ করে উঠলাম। বলতে হল, চলো।

চীনেম্যান বললে, কাম কাম, বাবু। হোয়াত্ ওয়ান্ত? (What want?)

টেনিদার ইংরেজী বিদ্যেও চীনেম্যানের মতোই। বললে, কট্ ওয়াণ্ট্।

—কত্? ভেরি নাইস্ কত্। দেয়ার আর মেনি। হুইচ্ তেক? (Cot? Very nice cot. There are many. Which take?)

—দিস্।—একটা দেখিয়ে দিয়ে টেনিদা বললে, কত দাম?

—তু হান্দ্রেদ্ লুপীজ—(Two hundred rupees).

—অ্যাঁ—দুশো টাকা! ব্যাটা বলে কী! পাগল না পেট-খারাপ? কী বলিস প্যালা—এর দাম দুশো হয় কখনো?

খানিকক্ষণ জ্বলন্ত চোখে টেনিদা তাকিয়ে রইল খাটের দিকে। বটে, চালাকি! তিনটে গোরা আর চোরাবাজারের-দোকানদার-ঠ্যাঙানো রক্ত নেচে উঠেছে মগজের মধ্যে। তারপরেই একলাফে উঠোনে অবতরণ, কুড়ুল আনয়ন—এবং—

অতগুলো বাড়তি কাঠ দিয়ে আর কী হবে! দিন কয়েক কয়লার অভাব তো মিটল। আর ঘরে আছে গোপালভোগ চাল—অতএব—

অতএব পোলাও।

খট্টাঙ্গের জয় হোক! আহা-হা কী পোলাও খেলাম! পোলাও নয়—পলান্ন। তার বর্ণনা আর করব না, পাছে দৃষ্টি দাও তোমরা!

চুপ করে থাকাই ভালো। যা দেখছি তা আশাপ্রদ নয়। পুরোনো খাট—রং-চং করে একটু চেহারা ফিরোবার চেষ্টা হয়েছে। খাট দেখে একটুও পছন্দ হল না। কিন্তু টেনিদা যখন পছন্দ করেছে, তখন প্রতিবাদ করে মার খাই আর কি! না-হয় ম্যালেরিয়াতেই ভুগছি, তাই বলে কি এতই বোকা?

বললাম, হুঁ, বড্ড বেশি বলছে।

টেনিদা বললে, সব ব্যাটা চোর! ওয়েল মিস্টার চীনেম্যান, পনেরো টাকায় দেবে?

—হো-হোয়াত্? ফিপ্তিন লুপীজ? দোন্ত জোক বাবু। গিভ্ এইতি লুপীজ। (What? Fifteen rupees? Don't joke, Babu! Give eighty rupees.)

—নাও—নাও চাঁদ—আর পাঁচ টাকা দিচ্ছি—

—দেন গিভ্ ফিপ্তি—

শেষ পর্যন্ত পঁচিশ টাকায় রফা হল।

খাট কিনে মহা উল্লাসে টেনিদা কুলির মাথায় চাপালে। আমাকে বললে, প্যালা, এবারে তুই বাড়ি যা—

পোলাও খাওয়ানোর কথাটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হল—কিন্তু লাভ কী! দোকানদার ঠেঙিয়ে সেই থেকে অগ্নিমূর্তি হয়ে আছে—পোলাওয়ের কথা বলে বিপদে পড়ব নাকি! মানে মানে বাড়ি পালানোই প্রশস্ত।

কিন্তু পোলাও ভোজন কপালে আছেই—ঠেকাবে কে!

পরের গল্পটুকু সংক্ষেপেই বলি। রাত্রে বাড়ি ফিরে খাটে শুয়েই টেনিদার লাফ। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছারপোকা—কাঁকড়াবিছে—পিশু,—কী নেই সেই চৈনিক খাটে! শোবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বালাময়ী অনুভূতি!

হাবুল সেন বলে যাচ্ছিল—পোলাও, ডিমের ডালনা, রুই মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা—

উস্-আস্ শব্দে নোলার জল টানল টেনিদা ঃ বলে যা—থামলি কেন ? মুর্গ মুসল্লম, বিরিয়ানি পোলাও, মশলা দোসে, চাউ-চাউ সামি কাবাব—

এবার আমাকে কিছু বলতে হয়। আমি জুড়ে দিলাম ঃ আলু ভাজা, শুক্তো, বাটি-চচ্চড়ি, কুমড়োর ছোকা—

টেনিদা আর বলতে দিলে না। গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল ঃ থাম প্যালা, থাম বলছি ! শুক্তো—বাটি-চচ্চড়ি !—দাঁত খিচিয়ে বললে, তার চেয়ে বল না, হিঞ্চে সেদ্ধ, গাঁদাল আর সিঙি মাছের ঝোল ! পালা-জ্বরে ভুগিস আর বাসক পাতার রস খাস, এর চাইতে বেশি বুদ্ধি আর কী হবে তোর ! দিব্যি অ্যায়সা অ্যায়সা মোগলাই খানার কথা হচ্ছিল, তার মধ্যে ধাঁ করে নিয়ে এল বাটি-চচ্চড়ি আর বিউলির ডাল ! ধ্যাত্তোর !

ক্যাবলা বললে, পশ্চিমে কুঁদরুর তরকারি দিয়ে ঠেকুয়া খায়। বেশ লাগে !

—বেশ লাগে ?—টেনিদা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল ঃ কাঁচা লঙ্কা আর ছোলার ছাতু আরো ভাল লাগে না ? তবে তাই খে-গে যা। তোদের মত উল্লুকের সঙ্গে পিকনিকের আলোচনাও ঝকমারি !

হাবুল সেন বললে, আহা-হা চেইত্যা যাইত্যাছ ক্যান ? পোলাপানে কয়—

—পোলাপান! এই গাড়োলগুলোকে জলপান করলে তবে রাগ যায়! তাও কি খাওয়া যাবে এগুলোকে? নিম-নিসিন্দের চেয়েও অখাদ্য! এই রইল তোদের পিকনিক—আমি চললাম! তোরা ছোলার ছাতু আর কাঁচা লঙ্কার পিণ্ডি গেল গে—আমি ওসবের মধ্যে নেই!

সত্যিই যে চলে যায় দেখছি! আর দলপতি চলে যাওয়া মানেই আমরা একেবারে অনাথ! আমি টেনিদার হাত চেপে ধরলাম: আহা, বোসো না! একটা প্ল্যান-ট্যান হোক। ঠাট্টাও বোঝ না?

টেনিদা গজগজ করতে লাগল: ঠাট্টা! কুমড়োর ছোকা আর কুঁদরুর তরকারি নিয়ে ওসব বিচ্ছিরি ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না!

—না—না, ওসব কথার কথা!—হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বোঝাতে লাগল: মোগলাই খানা না হইলে আর পিকনিক হইল কী?

—তবে লিস্টি কর—টেনিদা নড়ে-চড়ে বসল।

প্রথমে যে লিস্টিটা হল তা এইরকম:

বিরিয়ানি পোলাও

কোর্মা

কোপ্তা

কাবাব দু-রকম

মাছের চপ—

মাঝখানে বেরসিকের মতো বাধা দিলে ক্যাবলা: তাহলে বাবুর্চি চাই, একটা চাকর, একটা মোটর লরি, দুশো টাকা—

—দ্যাখ ক্যাবলা—টেনিদা ঘুসি বাগাতে চাইল।

আমি বললাম, চটলে কী হবে ? চারজন মিলে চাঁদা উঠেছে দশ টাকা ছ-আনা।

টেনিদা নাক চুলকে বললে, তাহলে একটু কম-সম করেই করা যাক। ট্যাঁক-খালির জমিদার সব—তোদের নিয়ে ভদ্দরলোকে পিক্‌নিক্ করে!

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি দিয়েছ ছ-আনা, বাকি দশ টাকা গেছে আমাদের তিনজনের পকেট থেকে। কিন্তু বললেই গাঁট্টা। আর সে গাঁট্টা ঠাট্টার জিনিস নয়—জুৎসই লাগলে স্রেফ গালপাট্টা উড়ে যাবে!

রফা করতে করতে শেষ পর্যন্ত লিস্টিটা যা দাঁড়ালো তা এই :

খিচুড়ি (প্যালা রাজহাঁসের ডিম আনিবে বলিয়াছে)

আলু ভাজা (ক্যাবলা ভাজিবে)

পোনা মাছের কালিয়া (প্যালা রাঁধিবে)

আমের আচার (হাবুল দিদিমার ঘরহইতে হাত-সাফাই করিবে)

রসগোল্লা, লেডিকেনি (ধারে 'ম্যানেজ' করিতে হইবে)

লিস্টি শুনে আমি হাঁড়িমুখ করে বললাম, ওর সঙ্গে আর একটা আইটেম জুড়ে দে হাবুল। টেনিদা খাবে।

—হেঁ—হেঁ প্যালার মগজে শুধু গোবর নেই, ছটাক-খানেক ঘিলুও আছে দেখছি!—বলেই টেনিদা আদর করে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে। 'গেছি গেছি' বলে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

আমরা পটলডাঙার ছেলে—কিছুতেই ঘাবড়াই না। চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে রোজ দু-বেলা আমরা গণ্ডায় গণ্ডায় হাতি-গণ্ডার সাবাড় করে থাকি। তাই বেশ ডাঁটের মাথায় বলেছিলাম, দুর-দুর! হাঁসের ডিম খায় ভদ্দরলোকে! খেতে হলে রাজহাঁসের ডিম! রীতিমতো রাজকীয় খাওয়া!

—কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে শুনি ? খুব যে চালিয়াতি করছিস, তুই ডিম পাড়বি নাকি ?—টেনিদা জানতে চেয়েছিল।

—আমি পাড়তে যাব কোন দুঃখে ? কী দায় আমার ?—আমি মুখ ব্যাজার করে বলেছিলাম ঃ হাঁসে পাড়বে।

—তাহলে সেই হাঁসের কাছ থেকে ডিম তোকেই আনতে হবে। যদি না আনিস, তাহলে—

তাহলে কী হবে বলবার দরকার ছিল না। কিন্তু কী গেরো বলো দেখি! কাল রবিবার—ভোরের গাড়িতেই আমরা বেরুব পিকনিকে। আজকের মধ্যেই রাজহাঁসের ডিম জোগাড় করতে না পারলে তো গেছি! পাড়ায় ভন্টাদের বাড়ি রাজহাঁস আছে গোটাকয়েক। ডিম-টিমও তারা নিশ্চয় পাড়ে। আমি ভন্টাকেই পাকড়ালাম। কিন্তু কী খলিফা ছেলে ভন্টা! দু-আনার পাঁঠার ঘুগনি আর ডজনখানেক ফুলুরি সাবড়ে তবে মুখ খুলল।

—ডিম দিতে পারি, তবে, নিজের হাতে বার করে নিতে হবে বাক্স থেকে।

—তুই দে না ভাই এনে! একটা আইসক্রীম খাওয়াব। ভন্টা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, নিজেরা পোলাও-মাংস সাঁটবেন আর আমার বেলায় আইসক্রীম! ওতে চলবে না। ইচ্ছে হয় নিজে বের করে নাও—আমি বাবা ময়লা ঘাঁটতে পারব না। কী করি, রাজি হতে হল।

ভন্টা বললে, দুপুরবেলা আসিস। বাবা মেজদা অফিসে যাওয়ার পরে। মা তখন ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয়। সেই সময় ডিম বের করে দেব।

গেলাম দুপুরে। উঠোনের একপাশে কাঠের বাক্স—তার

ভেতরে সার-সার খুপরি। গোটা-দুই হাঁস ভেতরে বসে ডিমে তা দিচ্ছে। ভণ্টা বললে, যা—নিয়ে আয়।

কিন্তু কাছে যেতেই বিদিকিচ্ছিভাবে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে উঠল হাঁসদুটো।

—ফোঁস-ফোঁস করছে যে!

ভণ্টা উৎসাহ দিলে: ডিম নিতে এসেছিস—একটু আপত্তি করবে না? তোর কোন ভয় নেই প্যালা—দে হাত ঢুকিয়ে।

হাত ঢুকিয়ে দেব? কিন্তু কী বিচ্ছিরি ময়লা!—ময়লা—আর কী বদখৎ গন্ধ! একেবারে নাড়ি উলটে আসে! তার ওপরে যে-রকম ঠোঁট ফাঁক করে ভয় দেখাচ্ছে—

ভণ্টা বললে, চিয়ার আপ্ প্যালা! লেগে যা!

যা থাকে কপালে বলে যেই হাত ঢুকিয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে—ওরে বাপরে! খটাং করে হাঁসটা হাত কামড়ে ধরলে। সে কী কামড়! হাঁই-মাই করে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

—কী হয়েছে রে ভণ্টা, নিচে এত গোলমাল কিসের?—ভণ্টার মা-র গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

আমি আর নেই! হ্যাঁচকা টানে হাঁসের ঠোঁট থেকে হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় লাগালাম। দর-দর করে রক্ত পড়ছে তখন!

রাজহাঁস এমন রাজকীয় কামড় বসাতে পারে কে জানত! কিন্তু কী ফেরেববাজ ভণ্টাটা! জেনে-শুনে ব্রাহ্মণের রক্তপাত ঘটালো! আচ্ছা—পিকনিকটা চুকে যাক—দেখে নেব তারপর! ওই পাঁঠার ঘুগনি আর ফুলুরির শোধ তুলে ছাড়ব!

কী করা যায়—গাঁটের পয়সা দিয়ে মাদ্রাজী ডিমই কিনতে হল গোটাকয়েক।

পরদিন সকালে শ্যামবাজার ইস্টিশানে পৌঁছে দেখি, টেনিদা,

ক্যাবলা আর হাবুল এর মধ্যেই মার্টিনের রেলগাড়িতে চেপে বসে আসে। সঙ্গে একরাশ হাঁড়ি-কলসি, চালের পুঁটুলি, তেলের ভাঁড়। গাড়িতে গিয়ে উঠতে টেনিদা হাঁক ছাড়ল ঃ এনেছিস রাজহাঁসের ডিম ?

দুর্গা-নাম করতে করতে পুঁটুলি খুলে দেখালাম।

—এর নাম রাজহাঁসের ডিম! ইয়ার্কি পেয়েছিল ?—টেনিদা গাঁট্টা বাগালো।

আমি গাড়ির খোলা দরজার দিকে সরে গেলাম ঃ মানে—ইয়ে, ছোট রাজহাঁস কিনা—

—ছোট রাজহাঁস! কী পেয়েছিস আমাকে শুনি ? পাগল না পেটখারাপ ?

হাবুল সেন বললে, ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও! ডিম তো আনছে!

টেনিদা গর্জন করে বললে, ডিম এনেছে না কচু! এই তোকে বলে রাখছি প্যালা—ডিমের ডালনা থেকে তোর নাম কেটে দিলাম। একটুকরো আলু পর্যন্ত নয়, একটু ঝোলও নয়!

মন খারাপ করে আমি বসে রইলাম। ডিমের ডালনা আমি ভীষণ ভালবাসি, তাই থেকেই আমাকে বাদ দেওয়া! আচ্ছা বেশ, খেয়ো তোমরা! এমন নজর দেব পেট ফুলে ঢোল হয়ে যাবে তোমাদের!

পিঁ করে বাঁশি বাজল—নড়ে উঠল মার্টিনের রেল। তারপর ধ্বস্‌-ধ্বস্‌ ভোঁস-ভোঁস করে এর রান্নাঘর, ওর ভাঁড়ার-ঘরের পাশ দিয়ে গাড়ি চলল।

টেনিদা বললে, বাগুইআটি ছাড়িয়ে আরো চারটে ইস্টিশান।

তার মানে প্রায় এক ঘণ্টার মামলা। লেডিকেনির হাঁড়িটা বের কর, ক্যাবলা।

ক্যাবলা বললে, এখুনি? তাহলে পৌঁছবার আগেই যে সাফ হয়ে যাবে!

টেনিদা বললে, সাফ হবে কেন, দুটো-একটা চেখে দেখব শুধু। আমার বাবা ট্রেনে চাপলেই খিদে পায়! এই একঘণ্টা ধরে শুধু-শুধু বসে থাকতে পারব না। বের কর্ হাঁড়ি—চটপট—

হাঁড়ি চটপটই বেরুল—মানে, বেরুতেই হল তাকে। তারপর মার্টিনের রেলের চলার তালে তালে ঝটপট করে সাবাড় হয়ে চলল। আমি, ক্যাবলা আর হাবুল সেন জুল-জুল করে শুধু তাকিয়েই রইলাম। একটা লেডিকেনি চেখে দেখতে আমরাও যে ভালবাসি, সে-কথা আর মুখ ফুটে বলাই গেল না।

ইস্টিশান থেকে নেমে প্রায় মাইলটাক হাঁটবার পরে ক্যাবলার মামার বাড়ি। কাঁচা রাস্তা, এঁটেল মাটি, তার ওপর কাল রাতে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে আবার। আগে থেকেই রসগোল্লার হাঁড়িটা বাগিয়ে নিল টেনিদা।

—এটা আমি নিচ্ছি। বাকি মোটঘাটগুলো তোরা নে।

—রসগোল্লা বরং আমি নিচ্ছি, তুমি চালের পোঁটলাটা নাও টেনিদা।—লেডিকেনির পরিণাম ভেবে আমি বলতে চেষ্টা করলাম।

টেনিদা চোখ পাকালো: খবর্দার প্যালা, ও-সব মতলব ছেড়ে দে। টুপটাপ করে দু-চারটে গালে ফেলবার বুদ্ধি, তাই নয়? হুঁ-হুঁ বাবা—চালাকি ন চলিষ্যতি!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাঁটরি বোঁচকা কাঁধে ফেলে আমরা তিনজনেই এগোলাম।

—কিন্তু তিন পাও যেতে হল না। তার আগেই ধাঁই—ধপাস্! টেনে একখানা রাম-আছাড় খেল হাবুল।

—এই খেয়েছে কচুপোড়া!—টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল।

সারা গায়ে কাদা মেখে হাবুল দাঁড়ালো। হাতের ডিমের পুঁটলিটা তখন কুঁকড়ে এতটুকু—হলদে রস গড়াচ্ছে তা থেকে।

ক্যাবলা বললে, ডিমের ডালনার বারোটা বেজে গেল!

তা গেল। করুণ চোখে আমরা তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে। ইস্—এত কষ্টের ডিম! ওরই জন্যে রাজহাঁসের কামড় পর্যন্ত খেতে হয়েছে।

টেনিদা হুঙ্কার করে উঠল ঃ দিলে সব পণ্ড করে! এই ঢাকাই বাঙালটাকে সঙ্গে এনেই ভুল হয়েছে! পিটিয়ে ঢাকাই পরোটা করলে তবে রাগ যায়!

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, হাবুল চার টাকা চাঁদা দিয়েছে—তার আগেই কী যেন একটা হয়ে গেল! হঠাৎ মনে হল আমার পা দুটো মাটি ছেড়ে শোঁ করে শূন্যে উড়ে গেল, আর তারপরেই…

কাদা থেকে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন আমার মাথা-মুখ বেয়ে আচারের তেল গড়াচ্ছে। ঐ অবস্থাতেই চেটে দেখলাম একটুখানি। বেশ ঝাল-ঝাল টক-টক—বেড়ে আচার করেছিল হাবুলের দিদিমা।

ক্যাবলা আবার ঘোষণা করলে, আমের আচারের একটা বেজে গেল!

টেনিদা ক্ষেপে বললে, চুপ কর বলছি ক্যাবলা—এক চড়ে গালের বোম্বা উড়িয়ে দেব!

কিন্তু তার আগেই টেনিদার বোম্বা উড়ল—মানে স্রেফ লম্বা হল কাদায়। সাত হাত দূরে ছিটকে গেল রসগোল্লার হাঁড়ি—

ধবধবে শাদা রসগোল্লাগুলো পাশের কাদাভরা খানায় গিয়ে পড়ে একেবারে নেবুর আচার !

ক্যাবলা বললে, রসগোল্লার ছুটো বেজে গেল !

এবার আর টেনিদা একটা কথাও বললে না। বলবার ছিলই বা কী ! রসগোল্লার শোকে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চারজনে পথ চলতে লাগলাম আমরা। টেনিদা তবু লেডিকেনিগুলো সাবাড় করেছে, কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা কোথায় ! অমন স্পঞ্জ রসগোল্লাগুলো !

পাঁচ মিনিট পরে টেনিদাই কথা কইল।

—তবু পোনামাছগুলো আছে, কী বলিস ? খিচুড়ির সঙ্গে মাছের কালিয়া আর আলুভাজা—নেহাৎ মন্দ হবে না—অঁ্যা ?

হাবুল বললে, হ-হ, সেই ভালো। বেশি খাইলে প্যাট গরম হইবো। গুরুপাক না খাওয়াই ভালো।

ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল ঃ শেয়াল বলেছিল দ্রাক্ষাফল অতিশয় খাট্টা !—ক্যাবলা ছেলেবেলায় পশ্চিমে ছিল, তাই দু-একটা হিন্দী শব্দ বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে।

টেনিদা বললে, খাট্টা ! বেশি পাঁঠ্ঠামি করবি তো চাঁট্টা বসিয়ে দেব !

ক্যাবলা ভয়ে স্পীকটি নট। আমি তখনও নাকের পাশ দিয়ে ঝাল-ঝাল টক-টক তেল চাটছি। হঠাৎ বুক-পকেটটা কেমন ভিজে ভিজে মনে হয়। হাত দিয়ে দেখি, বেশ বড়ো-সড়ো একটুকরো আমের আচার তার ভেতরে কায়েমি হয়ে আছে।

—জয় গুরু ! এদিক-ওদিক তাকিয়ে টপ করে সেটা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলাম। সত্যি—হাবুলের দিদিমা বেড়ে আচার করেছিল ! আরো গোটাকয়েক যদি ঢুকত !

বাগান-বাড়িতে পৌঁছুলাম আরো পনেরো মিনিট পরে।

চারিদিকে সুপুরি আর নারকেলের বাগান—একটা পানা-ভর্তি পুকুর, মাঝখানে একতলা বাড়িটা। কিন্তু ঘরে চাবিবন্ধ। মালীটা কোথায় কেটে পড়েছে কে জানে!

টেনিদা বললে, কুছ্ পরোয়া নেই। চুলোয় যাক মালী। বলং বলং বাহুবলং! নিজেরা উনুন খুঁড়ব—খড়ি কুড়ুব, রান্না করব—মালী ব্যাটা থাকলেই তো ভাগ দিতে হত! যা হাবুল—ইঁট কুড়িয়ে আন্—উনুন করতে হবে। প্যালা, কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আয়,—ক্যাবলাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যা।

—তার তুমি?—আমি ফস্ করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

—আমি?—একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে টেনিদা হাই তুলল: আমি এগুলো সব পাহারা দিচ্ছি। সবচাইতে কঠিন কাজটাই নিলাম আমি। শেয়াল কুকুর এলে তাড়াতে হবে তো! —যা তোরা—হাতে-হাতে বাকি কাজগুলো চটপট সেরে আয়।

কঠিন কাজই বটে! ইস্কুলের পরীক্ষার গার্ডদেরও অমনি কঠিন কাজ করতে হয়। ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষতে গিয়ে যখন 'ঘোড়া-ঘোড়া ঘাস-ঘাস' নিয়ে আমাদের দম আটকাবার জো, তখন গার্ড মোহিনীবাবুকে টেবিলে পা তুলে দিয়ে 'ফোঁরর্-ফোঁ' শব্দে নাক ডাকাতে দেখেছি।

টেনিদা বললে, যা—যা সব—দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঝাঁ করে রান্নাটা করে ফ্যাল—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে!

তা পেয়েছে বৈকি! পুরো একহাঁড়ি লেডিকেনি এখনো গজ-গজ করছে পেটের ভেতর! আমাদের বরাতেই শুধু অষ্টরম্ভা। প্যাঁচার মতো মুখ করে আমরা কাঠখড়ি সব কুড়িয়ে আনলাম।

টেনিদা লিস্টি বার করে বললে, মাছের কালিয়া। প্যালা রাঁধিবে।

আমাকে দিয়েই শুরু! আমি মাথা চুলকে বললাম, খিচুড়ি-টিচুড়ি আগে হয়ে যাক—তবে তো ?

—খিচুড়ি লাস্ট আইটেম—গরম-গরম খেতে হবে। কালিয়া সকলের আগে। নে প্যালা—লেগে যা—

ক্যাবলার মা মাছ কেটে নুন-টুন মাখিয়ে নিয়েছিলেন, তাই রক্ষা! কড়াইতে তেল চাপিয়ে আমি মাছ ঢেলে দিলাম তাতে।

আরে—এ কী কাণ্ড! মাছ দেবার সঙ্গে-সঙ্গে কড়াই-ভর্তি ফেনা! তারপরেই আর কথা নেই—অতগুলো মাছ তালগোল পাকিয়ে গেল একসঙ্গে। মাছের কালিয়া নয়—মাছের হালুয়া!

ক্যাবলা আদালতের পেয়াদার মতো ঘোষণা করলো ঃ মাছের কালিয়ার তিনটে বেজে গেল!

—তবে রে স্টুপিড!—টেনিদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ঃ কাঁচা তেলে মাছ দিয়ে তুই কালিয়া রাঁধছিস ? এবার তোর পালাজ্বরের পিলেরই একদিন কি আমারই একদিন!

এ তো মার্টিনের রেল নয়—সোজা মাঠের রাস্তা। আমার কান পাকড়াবার জন্যে টেনিদার হাতটা এগিয়ে আসবার আগেই আমি হাওয়া। একেবারে পাঞ্জাব মেলের স্পীডে।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, খিচুড়ির লিস্ট থেকে প্যালার নাম কাটা গেল।

তা যাক। কপালে আজ হরি-মটর আছে সে তো গোড়াতেই বুঝতে পেরেছি! গোমড়া মুখে একটা আমড়া-গাছতলায় এসে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম।

বসে বসে কাঠ-পিঁপড়ে দেখছি, হঠাৎ গুটি-গুটি হাবুল আর ক্যাবলা এসে হাজির।

—কী রে, তোরাও ?

ক্যাবলা ব্যাজার মুখে বললে, খিচুড়ি টেনিদা নিজেই রাঁধবে। আমাদের আরো খড়ি আনতে পাঠাল।

সেই মুহূর্তেই হাবুল সেনের আবিষ্কার। একেবারে কলম্বাসের আবিষ্কার যাকে বলে!

—এই প্যালা—দ্যাখছস? ঐ গাছটায় কী রকম জলপাই পাকছে!

আর বলতে হল না। আমাদের তিনজনের পেটেই তখন ক্ষিদেয় ইঁদুর লাফাচ্ছে। জলপাই—জলপাই-ই সই! সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাছে উঠে পড়লাম। আহা—টক-টক—মিঠে-মিঠে জলপাই—যেন অমৃত!

হাবুলের খেয়াল হল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

—এই, টেনিদার খিচুড়ি কী হইল?

ঠিক কথা—খিচুড়ি তো এতক্ষণে হয়ে যাওয়া উচিত! তড়াক করে গাছ থেকে নেমে পড়ল ওরা। হাতের কাছে পাতা-টাতা যা পেল, তাই নিয়ে ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে। আমিও গেলাম পেছনে-পেছনে, আশায়-আশায়। মুখে যাই বলুক—এক হাতা খিচুড়িও কি আমায় দেবে না? প্রাণ কি এত পাষাণ হবে টেনিদার?

কিন্তু খানিক দূর এগিয়ে আমরা তিনজনেই থমকে দাঁড়ালাম। একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ!

টেনিদা সেই নারকেল গাছটা হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর মাঝে-মাঝে বলছে, দে—দে ক্যাবলা, পিঠটা আর-একটু ভাল করে চুলকে দে!

পিঠ চুলকে দিচ্ছে—সন্দেহ কী! কিন্তু সে ক্যাবলা নয়—একটা গোদা বানর। আর চার-পাঁচটা গোল হয়ে বসেছে টেনিদার চারিদিকে। কয়েকটাতে মুঠো-মুঠো চাল-ডাল মুখে

পুরছে, একটা আলুগুলো সাবাড় করছে আর আস্তে-আস্তে টেনিদার পিঠ চুলকে দিচ্ছে। আরামে হাঁ করে ঘুমুচ্ছে টেনিদা, আর থেকে-থেকে বলছে, দে ক্যাবলা, আর-একটু ভালো করে চুলকে দে !

এবার আমরা তিনজনে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—টেনিদা—বাঁদর—বাঁদর !

—কী ! আমি বাঁদর !—বলেই টেনিদা হাঁ করে সোজা হয়ে বসল—সঙ্গে সঙ্গেই বাপ্ বাপ্ বলে চিৎকার।

—ইঁ-ইঁ—ক্লিচ্-ক্লিচ্! কিচ্-কিচ্!

চোখের পলকে বানরগুলো কাঁঠাল গাছের মাথায়। চাল-ডাল আলুর পুঁটলিও সেইসঙ্গে। আমাদের দেখিয়ে-দেখিয়ে তরিবৎ করে খেতে লাগল—সেইসঙ্গে কী বিচ্ছিরি ভেংচি ! ঐ ভেংচি দেখেই না লঙ্কার রাক্ষসগুলো ভয় পেয়ে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল !

পুকুরের ঘাটটায় চারজনে আমরা পাশাপাশি চুপ করে বসে রইলাম। যেন শোকসভা ! খানিক পরে ক্যাবলাই স্তব্ধতা ভাঙল।

—বন-ভোজনের চারটে বাজল !

—তা বাজল।—টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঃ কিন্তু কী করা যায় বল্ তো প্যালা ? সেই লেডিকেনিগুলো কখন হজম হয়ে গেছে—পেট চুঁই-চুঁই করছে ক্ষিদেয় !

অগত্যা আমি বললাম, বাগানে একটা গাছে জলপাই পেকেছে টেনিদা—

—জলপাই ! ইউরেকা ! বনে ফল ভোজন—সেইটেই তো আসল বন-ভোজন ! চল চল, শিগগির চল ! লাফিয়ে উঠে টেনিদা বাগানের দিকে ছুটল।

পরের উপকার করিও না

আমি প্যালারাম, ক্যাবলা আর হাবুল সেন—তিনজনে নেহাত গোবেচারার মতো কাঁচুমাচু মুখ করে বসে আছি। তাকিয়ে আছি কাঠগড়ায় আসামীর দিকে। তার মুখ আমাদের চেয়েও করুণ। ছ-ফুট লম্বা অমন জোয়ানটা ভয়ে কেন্নোর মতো কুঁকড়ে গেছে। গণ্ডারের খাঁড়ার মতো খাড়া নাকটাও যেন চেপসে গেছে একটা থ্যাবড়া ব্যাঙের মতো। সাধুভাষায় যাকে বলে, দস্তুরমতো পরিস্থিতি!

কে আসামী?

আর কে হতে পারে? আমাদের পটলডাঙার সেই স্বনামধন্য টেনিদা। গড়ের মাঠে গোরা ঠ্যাঙানোর সেই প্রচণ্ড প্রতাপ এখন একটা চায়ের কাপের মতো ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছে। চায়ের কাপ না বলে চিরতার গেলাসও বলতে পারা যায় বোধহয়।

—হুজুর ধর্মাবতার—

ফরিয়াদী পক্ষের উকিল লাফিয়ে উঠলেন। মনে হল যেন হাত-দশেক ছিটকে উঠল একটা কুড়ি-নম্বরী ফুটবল। গলার আওয়াজ তো নয়—যেন আট-দশটা চিনে-পটকা ফাটল একসঙ্গে। ধর্মাবতার চেয়ারের ওপর আঁৎকে উঠে পড়তে পড়তে সামলে গেলেন।

—অমন বাজখাঁই গলায় চেঁচাবেন না মশাই, পিলে চমকে যায়!—জজ সাহেব ভ্রূ কোঁচকালেন: কী বলতে হয় ঝটপট বলে ফেলুন।

উকিল একটা ঘুসি বাগিয়ে তাকালেন টেনিদার দিকে।

একরাশ কালো কালো আলপিনের মতো গোঁফগুলো তাঁর খাড়া হয়ে উঠল।

—ধর্মাবতার, আসামী ভজহরি মুখুজ্জে (আমাদের টেনিদা) কী অন্যায় করেছে, তা আপনি শুনেছেন। অবোলা জীবের ওপর ভীষণ অত্যাচার সে করেছে, তার নিন্দের ভাষা নেই। একটা ছাগল পরশু থেকে কাঁচা ঘাস পর্যন্ত হজম করতে পারছে না। আর-একটা সমানে বমি করছে। আর-একটা তিন দিন ধরে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে—ফরিয়াদীর একটা ট্যাঁক-ঘড়ি সুদ্ধু চিবিয়ে ফেলেছে।

রোগা সিঁটকে একটা লোক, হলধর পালুই—সে-ই ফরিয়াদী। হলধর ফোঁস্-ফোঁস্ করে কাঁদতে লাগল।

—খুব ভালো ঘড়ি ছিল হুজুর—কী শক্ত! আমার ছেলে ঐটে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আম পাড়ত। চলত না বটে, তবু ঘড়ির মতো ঘড়ি ছিল একটা!—বলে হলধর এবার ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল। কান্নার বেগ একটু থামলে বললে, ঘড়ি না-হয় যাক হুজুর, কিন্তু আমার অমন তিনটে ছাগল! বুঝি পাগল হয়ে গেল হুজুর—একেবারে উদ্দাম পাগল!

জজ কানে একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে চুলকোতে চুলকোতে বিরক্ত মুখে বললেন, আঃ—জ্বালাতন! আরে বাপু, তুমিও তো দেখছি একটা ছাগল! ছাগল কখনো পাগল হয়? সে যাক, অপরাধের গুরুত্ব চিন্তা করে আমি আসামী ভজহরি মুখুজ্জেকে তিন টাকা জরিমানা করলাম। এই তিন টাকা ফরিয়াদী হলধর পালুইকে দেওয়া হবে তার ছাগলদের রসগোল্লা খাওয়াবার জন্যে।

জজ উঠে পড়লেন।

টেনিদা আমাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ভাবটা এই ঃ এ-যাত্রা তরিয়ে দে! আমার ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ!

আমি ক্যাবলা আর হাবুল সেন—'চারমূর্তি'র তিন মূর্তি—চাঁদা করে তিন টাকা জমা দিয়ে টেনিদাকে খালাস করে আনলাম।

নিঃশব্দে চার জন পথ দিয়ে চলেছি। কে যে কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

খানিক পরে আমি বললাম, খুব ফাঁড়া কেটে গেছে!

ক্যাবলা বললে, হ্যাঁ—জেল হয়ে যেতে পারত!

হাবুল ঢাকাই ভাষায় বললে, হ, দ্বীপান্তরও হইতে পারত! একটা ছাগল যদি মইর‍্যা যাইতগা, তাইলে ফাঁসি হওনই বা আশ্চর্য আছিল কী!

এতক্ষণ পরে টেনিদা গাঁক-গাঁক করে উঠল ঃ চুপ কর, মেলা বাজে বকিসনি! ইঃ, ফাঁসি! ফাঁসি হওয়া মুখের কথা কিনা!

আবার নিস্তব্ধতা। টেনিদার পেছু-পেছু আমরা গড়ের মাঠের দিকে এগিয়ে চললাম। খানিক পরে আমিই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, চানাচুর খাবে টেনিদা?

—নাঃ—টেনিদার মুখে-চোখে একটা গভীর বৈরাগ্য।

—আইসক্রীম কিনুম?—হাবুল সেনের প্রশ্ন।

—কিচ্ছু না—টেনিদা একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঃ মন খিঁচড়ে গেছে—বুঝলি প্যালা! সংসারে কারুর উপকার করতে নেই!

আমি বললাম, নিশ্চয় না!

—উপকারীকে বাঘে খায়।—ক্যাবলা বললে।

—আমার মনের কথাটা বলে দিয়েছিস!—বলে টেনিদা ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দিলে। ক্যাবলা 'উঃ উঃ' করে উঠল।

হাবুল বললে, বিনা উপকারেই যখন পৃথিবী চলতে আছে, তখন উপকার করতে গিয়া খামাখা ঝামেলা বাড়াইয়া হইবো কী ?

—যা কইছস !—মনের আবেগে টেনিদা এবার হাবুলের ভাষাতেই হাবুলকে সমর্থন জানালো। তারপর গর্জন করে বললে, আমি আর একখানা নতুন বর্ণ-পরিচয় লিখব। তার প্রথম পাঠ থাকবে ঃ কখনও পরের উপকার করিও না !

ক্যাবলা বললে, সাধু, সাধু !

টেনিদা দাঁত খিচিয়ে বললে, সাধু ! খবরদার সাধু-ফাধুর নাম আমার কাছে আর করবিনে ! যদি ব্যাটাকে পাই—বলে, প্রচণ্ড একটা ঘুসি হাঁকালো আকাশের দিকে।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি গোড়া থেকে।

মানুষের অনেক রকম রোগ হয় ঃ কালাজ্বর, পালাজ্বর, নিমোনিয়া, কলেরা, পেটফাঁপা—এমনকি ঝিনঝিনিয়া পর্যন্ত। সব রোগের ওষুধ আছে, কিন্তু একটি রোগের নেই। সে হল পরোপকার। যখন চাগায় তখন অন্য লোকের প্রাণান্ত করে ছাড়ে।

টেনিদাকে একদিন এই রোগে ধরল। ছিল বেশ, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছিল-দাচ্ছিল কাঁসি বাজাচ্ছিল। হঠাৎ কী যে হল—কালীঘাটের এক সাধুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

হাতে চিমটে, মাথায় জটা, লেংটি পরা এক বিরাটকায় সাধু। খানিকক্ষণ কটমট করে টেনিদার দিকে তাকিয়ে হেঁড়ে গলায় বললে, দে পাঁচসিকে পয়সা !

পাঁচসিকে পয়সা ! টেনিদা বলতে যাচ্ছিল, ইয়ার্কি নাকি ! কিন্তু সাধুর বিশাল চেহারা, বিরাট চিমটে আর জবাফুলের মতো

টেনিদা আমাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ভাবটা এই ঃ এ-যাত্রা তরিয়ে দে! আমার ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ!

আমি ক্যাবলা আর হাবুল সেন—'চারমূর্তি'র তিন মূর্তি—চাঁদা করে তিন টাকা জমা দিয়ে টেনিদাকে খালাস করে আনলাম।

নিঃশব্দে চার জন পথ দিয়ে চলেছি। কে যে কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

খানিক পরে আমি বললাম, খুব ফাঁড়া কেটে গেছে!

ক্যাবলা বললে, হ্যাঁ—জেল হয়ে যেতে পারত!

হাবুল ঢাকাই ভাষায় বললে, হ, দ্বীপান্তরও হইতে পারত! একটা ছাগল যদি মইর‍্যা যাইতগা, তাইলে ফাঁসি হওনই বা আশ্চর্য আছিল কী!

এতক্ষণ পরে টেনিদা গাঁক-গাঁক করে উঠল ঃ চুপ কর, মেলা বাজে বক্সিনি! ইঃ, ফাঁসি! ফাঁসি হওয়া মুখের কথা কিনা!

আবার নিস্তব্ধতা। টেনিদার পেছু-পেছু আমরা গড়ের মাঠের দিকে এগিয়ে চললাম। খানিক পরে আমিই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, চানাচুর খাবে টেনিদা?

—নাঃ—টেনিদার মুখে-চোখে একটা গভীর বৈরাগ্য।

—আইসক্রীম কিনুম?—হাবুল সেনের প্রশ্ন।

—কিচ্ছু না—টেনিদা একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঃ মন খিঁচড়ে গেছে—বুঝলি প্যালা! সংসারে কারুর উপকার করতে নেই!

আমি বললাম, নিশ্চয় না!

—উপকারীকে বাঘে খায়।—ক্যাবলা বললে।

—আমার মনের কথাটা বলে দিয়েছিস!—বলে টেনিদা ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দিলে। ক্যাবলা 'উঃ উঃ' করে উঠল।

হাবুল বললে, বিনা উপকারেই যখন পৃথিবী চলতে আছে, তখন উপকার করতে গিয়া খামাখা ঝামেলা বাড়াইয়া হইবো কী?

—যা কইছস!—মনের আবেগে টেনিদা এবার হাবুলের ভাষাতেই হাবুলকে সমর্থন জানালো। তারপর গর্জন করে বললে, আমি আর একখানা নতুন বর্ণ-পরিচয় লিখব। তার প্রথম পাঠ থাকবে ঃ কখনও পরের উপকার করিও না!

ক্যাবলা বললে, সাধু, সাধু!

টেনিদা দাঁত খিচিয়ে বললে, সাধু! খবরদার সাধু-ফাধুর নাম আমার কাছে আর করবিনে! যদি ব্যাটাকে পাই—বলে, প্রচণ্ড একটা ঘুসি হাঁকালো আকাশের দিকে।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি গোড়া থেকে।

মানুষের অনেক রকম রোগ হয় ঃ কালাজ্বর, পালাজ্বর, নিমোনিয়া, কলেরা, পেটফাঁপা—এমনকি ঝিনঝিনিয়া পর্যন্ত। সব রোগের ওষুধ আছে, কিন্তু একটি রোগের নেই। সে হল পরোপকার। যখন চাগায় তখন অন্য লোকের প্রাণান্ত করে ছাড়ে।

টেনিদাকে একদিন এই রোগে ধরল। ছিল বেশ, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছিল-দাচ্ছিল কাঁসি বাজাচ্ছিল। হঠাৎ কী যে হল—কালীঘাটের এক সাধুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

হাতে চিমটে, মাথায় জটা, লেংটি পরা এক বিরাটকায় সাধু। খানিকক্ষণ কটমট করে টেনিদার দিকে তাকিয়ে হেঁড়ে গলায় বললে, দে পাঁচসিকে পয়সা!

পাঁচসিকে পয়সা! টেনিদা বলতে যাচ্ছিল, ইয়ার্কি নাকি! কিন্তু সাধুর বিশাল চেহারা, বিরাট চিমটে আর জবাফুলের মতো

চোখ দেখে ভেবড়ে গেল। তো-তো করে বললে, পাঁচসিকে তো নেই বাবা, আনা-সাতেক হবে!

—আনা-সাতেক? আচ্ছা তাই দে, আর একটা বিড়ি।

—বিড়ি তো আমরা খাইনে বাবাঠাকুর!

—হুঁ, গুড-বয় দেখছি! তা বেশ। বিড়ি-ফিড়ি কক্ষনো খাসনি—ওতে যক্ষ্মা হয়! যাক—পয়সাই দে।

পয়সা হাতে পেয়ে সাধুর হাঁড়ির মতো মুখখানা খুশিতে ভরে উঠল। ঝুলি থেকে একটা জবা ফুল বের করে টেনিদার মাথায় দিয়ে বললে, তুই এখানে কেন রে?

—আজ্ঞে প্যাঁড়া খেতে এসেছিলাম।

সাধু বললে, তা বলছি না। তুই যে মহাপুরুষ রে! তোকে দেখে মনে হচ্ছে, পরোপকার করে তুই দেশজোড়া নাম করবি!

—পরোপকার!—টেনিদা একটা ঢোক গিলে বললে, দুনিয়ায় অনেক সৎকাজ করেছি বাবা। মারামারি, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়া, ইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতের টিকি কেটে নেওয়া—কিন্তু কখনো তো পরোপকার করিনি!

—করিসনি মানে? সাধু হেঁড়ে গলায় বললে, তুই ছোকরা তো বড্ড এঁড়ে-তক্কো করিস! এই আমাকে নগদ সাত আনা পয়সা দিলি, খেয়াল নেই বুঝি? আমার কথা শোন্! সংসার-টংসার ছেড়ে স্রেফ হাওয়া হয়ে যা। দুনিয়ায় মানুষের অশেষ দুঃখ—সেই দুঃখ দূর করতে আদা-নুন খেয়ে লেগে পড়্। আর্তের সেবা কর্—দেখবি তিন দিনেই তোর নামে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। দে-দে একটা বিড়ি দে—

—বললাম যে বাবাঠাকুর, আমি বিড়ি খাই না।

—ওহো, তাও তো বটে ! বেশ, বেশ বিড়ি কখনো খাসনি। আর শোন্—পরের উপকারে নশ্বর জীবন বিলিয়ে দে। আজ থেকেই লেগে যা—বলে কান থেকে একটা আধপোড়া বিড়ি নামিয়ে, সেটা ধরিয়ে সাধু ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হল।

টেনিদা খানিকক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরেই—কালীঘাটের মা কালীর মহিমাতেই কি না কে জানে—সাধুর কথাগুলো তার মাথার মধ্যে পাক খেতে লাগল। পরোপকার ? সত্যিই তো, তার মতো কি আর জিনিস আছে ! জীবন আর ক-দিনের ? সবই তো মায়া—স্রেফ ছলনা ! সুতরাং যে-কদিন বাঁচা যায়—লোকের ভালো করেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।

সেই রাত্রেই সংসার ছাড়ল টেনিদা। মানে কলকাতা ছাড়ল।

গেল দেশে। কলকাতা থেকে মাইল-দশেক দূরে ক্যানিং লাইনে বাড়ি। গাঁয়ের নাম ধোপাখোলা। দেশের বাড়িতে দূর-সম্পর্কের এক বুড়ি জ্যাঠাইমা থাকেন। কানে খাটো। টেনিদাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁরে, এমন অসময়ে দেশে এলি যে ?

—পরোপকার করব জেঠিমা !

—পুরী খেতে এসেছিস ? পুরী এখানে কোথায় বাবা ? পোড়া দেশে কি আর ময়দা-ফয়দা কিছু আছে ? ইংরেজ রাজত্বে আর বেঁচে সুখ নেই !

—ইংরেজ রাজত্ব কোথায় জেঠিমা ? এখন তো আমরা স্বাধীন, মানে—টেনিদা বাংলা করে বুঝিয়ে দিলে, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট !

—কোট-প্যাণ্ট ?—জ্যেঠিমা বললেন, ছি বাবা, আমি বিধবা মানুষ, কোট-প্যাণ্ট পরব কেন ? থান পরি।

—দুত্তোর—এ যে মহা জ্বালা হল ! আমি বলছিলাম, দেশে রোগ-বালাই কিছু আছে ?

—মালাই ! মালাই খাবি ? দুধই পাওয়া যায় না ! গো-মড়কে সব গরু উচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

—উঃ—কানে হাত দিয়ে টেনিদা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু দিন-তিনেক গ্রামে ঘুরে টেনিদা বুঝতে পারল, সত্যিই পরোপকারের অখণ্ড সুযোগ আছে। গ্রাম জুড়ে দারুণ ম্যালেরিয়া। পেটভরা পিলে নিয়ে সারা গাঁয়ের লোক রাত-দিন বোঁ-বোঁ করছে। সেইদিনই কলকাতায় ফিরল টেনিদা। পাঁচ-বোতল তেতো পাঁচন কিনে নিয়ে দেশে চলে গেল। কিন্তু দুনিয়াটা যে কী যাচ্ছেতাই জায়গা, সেটা টের পেতে তার দেরি হল না।

অসুখে ভুগে মরবে, তবু ওষুধ খাবে না।

একটা জামগাছের নিচে বসে ঝিমুচ্ছিল গজানন সাঁতরা। সন্দেহ কী—নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়া ! টেনিদা গজাননের দিকে এগিয়ে এল। তারপর গজানন ব্যাপারটা বুঝতে না বুঝতে এবং ট্যাঁ-ফোঁ করে উঠবার আগেই টেনিদা তার মুখে আধ বোতল জ্বরারি পাঁচন ঢেলে দিলে। যেমন বিচ্ছিরি, তেমনি তেতো। আসলে গজাননের জ্বর-ফর কিছু হয়নি—খেয়েছিল খানিকটা তাড়ি। যেমন পাঁচন পড়া—নেশা ছুটে গিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর সোজা 'মার-মার' শব্দে টেনিদাকে তাড়া করল।

কিন্তু ধরতে পারবে কেন ? লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে টেনিদা ততক্ষণে পগার পার।

কী সাঙ্ঘাতিক লোক এই গজানন ! পরোপকার বুঝল না, —বুঝল না টেনিদার মধ্যে আজ মহাপুরুষ জেগে উঠেছে। তবু হাল ছাড়লে চলবে না। পরের ভালো করতে গেলে এমন কিছু-

না-কিছু হয়ই। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে টেনিদা স্বগতোক্তি করলে, এই ছ্যাখো না বিদ্যাসাগর মশাই···

পরদিন বিকেলে সে গেল গ্রামের পাঁচুমামার বাড়িতে। একটা ভাঙা ইজিচেয়ারে শুয়ে পাঁচুমামা উঃ-আঃ করছেন।

—কী হয়েছে মামা ?—বগল থেকে পাঁচনের বোতলটা বাগিয়ে দাঁড়ালো টেনিদা।

—এই গেঁটে বাত বাবা! গাঁটে গাঁটে ব্যথা। করুণ স্বরে পাঁচুমামা জানালেন।

—বাত ? ওঃ!—টেনিদা মুহূর্তের জন্যে কেমন দমে গেল। তারপরেই উৎসাহের চিহ্ন ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

—আর ম্যালেরিয়া ? ম্যালেরিয়া কখনো হয়নি ?

—হয়েছিল বৈকি। গত বছর।

—হতেই হবে!—বিজ্ঞের মতো গম্ভীর গলায় টেনিদা বললে, ঐ হল রোগের জড়। ঐ ম্যালেরিয়া থেকেই সব। কিন্তু ভেবো না—বাত-ফাত সব ভালো করে দিচ্ছি।

—ভাল করে দিবি ?—পাঁচুমামার মুখে-চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে বেরুল ঃ তুই তাহলে ডাক্তার হয়ে এসেছিস ? কই শুনিনি তো!

—ডাক্তার কী বলছ মামা—তার চেয়ে ঢের বড়! একেবারে মহাপুরুষ!

অগাধ বিস্ময়ে পাঁচুমামা হাঁ করলেন। টেনিদার দিকেই মুখ করে ছিলেন; কাজেই হাঁ করার সঙ্গে সঙ্গেই আর কথা নয়—সোজা জ্বরারি পাঁচন চলে গেল মামার গলার মধ্যে।

—ওয়াক্-ওয়াক্! ওরে বাবা রে—ডাকাত রে—মেরে ফেললে রে—ওয়াক্-ওয়াক্—গেছি-গেছি—পাঁচুমামা হাহাকার করে উঠলেন।

টেনিদা ততক্ষণে বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে। শুনতে পেল, ভেতর থেকে মামা অশ্রাব্য ভাষায় তাকে গাল দিচ্ছেন। তা দিন—তাতে কিছু আসে যায় না। পরোপকার তো হয়েছে! এর দাম মামা বুঝবে যথাসময়ে। তৃপ্তির হাসি নিয়ে টেনিদা পথ চলল।

খানিক দূর আসতেই চোখে পড়ল, একটা আমগাছ-তলায় একটি বছর-আটেকের ছেলে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চ্যাচাচ্ছে।

—এই, কী নাম তোর ?

ছেলেটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, লাড্ডু।

—লাড্ডু! তা অমন করে কাঁদছিস কেন ? চোখের জলে যে হালুয়া হয়ে যাবি—আর লাড্ডু থাকবি না! কী হয়েছে তোর ?

—বড়দা চাঁটি মেরেছে।

—কেন, তোকে তবলা ভেবেছিল বুঝি ?

—না! লাড্ডু বললে, আমি কাঁচা আম খেতে চেয়েছিলাম।

—এই কার্তিক মাসে কাঁচা আম খেতে চেয়েছিস! শুধু চাঁটি নয়, গাঁট্টা খাওয়ার মতো শখ!

টেনিদা চলে যাচ্ছিল, কি মনে হতেই ফিরে দাঁড়ালো হঠাৎ।

—তোর টক খেতে খুব ভাল লাগে বুঝি ?

লাড্ডু মাথা নাড়ল।

—হুঁ—নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়ার লক্ষণ! তোর জ্বর হয় ?

—হয় বৈকি!

—তবে আর কথা নেই—টেনিদা বোতল বের করে বললে, হাঁ কর—

লাড্ডু আশান্বিত হয়ে বললে, আচার বুঝি ?

—আচার বলে আচার! দুরাচার, কদাচার, সদাচার—সকলের সেরা এই আচার! হাঁ কর—হাঁ কর ঝটপট—

লাড্ডু হাঁ করল।

তার পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। 'বাপরে মা-রে বড়দা-রে' বলে লাড্ডু চেঁচিয়ে উঠল।

টেনিদা দ্রুত পা চালালো।

—বাপ!—

পিঠের উপর একটা ঢিল পড়তেই চমকে উঠল টেনিদা। লাড্ডু ঢিল চালাচ্ছে। অতএব যঃ পলায়তি—এবং প্রাণপণে। লাড্ডু বাচ্চা হলেও ঢিলে বেশ জোর আছে, হাতের তাকও তার ফসকায় না।

কিন্তু আর চলে না! গ্রামের লোক ক্ষেপে উঠেছে তার ওপর। বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখলে হৈ-হৈ করে ওঠে। রাস্তায় দেখলে তেড়ে আসে। তাকে দেখলে ছেলেপুলে পালাতে পথ পায় না।

জ্যাঠাইমা বললেন, তুই কী শুরু করেছিস বাবা? লোকে যে তোকে ঠ্যাঙাবার ফন্দি আঁটছে!

টেনিদা গম্ভীর হয়ে রইল। পরে বললে, পরের জন্যে আমি প্রাণ দেব জেঠিমা!

—কী বললি? ঘরের লোকের কান কেটে নিবি? কী সর্বনাশ! ওগো, আমাদের টেনু কি পাগল হয়ে গেল গো—মড়াকান্না জুড়লেন জ্যাঠাইমা।

উদাস ব্যথিত মনে পথে বেরিয়ে পড়ল টেনিদা। কী অকৃতজ্ঞ নরাধম দেশ! এই দেশের উপকারের জন্যে সে মরীয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ কেউ বুঝছে না তার কদর! ছিঃ ছিঃ! এইজন্যেই দেশ আজ পরাধীন—থুড়ি—স্বাধীন! কিন্তু কী করা যায়? কী ভাবে মানুষগুলোর উপকার করা যায়?

টেনিদা শূন্য মনে একটা গাছতলায় এসে বসল। ভরা দুপুর। কার্তিক মাসের নরম রোদের সঙ্গে ঝিরঝিরে হাওয়া। আকুল হয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ চটকা ভেঙে গেল।

একটু দূরে একটা নিমগাছের নিচে একটা ছাগল ঝিমুচ্ছে।

ঝিমুচ্ছে! ভারি খারাপ লক্ষণ! এখানকার জলে হাওয়ায় ম্যালেরিয়া! ছাগলকেও ধরেছে। ধরাই স্বাভাবিক! আহা—অবোলা জীব! উপকার করতে হয়, তো ওদেরই! কেউ কখনো ওদের দুঃখ বোঝে না। আহা!

তাছাড়া সুবিধেও আছে। মানুষের মতো এরা অকৃতজ্ঞ নয়। উপকার করতে গেলে তেড়ে মারতেও আসবে না। ঠিক কথা—আজ থেকে সেই অসহায় প্রাণীগুলোর ভালো করাই তার ব্রত। ছিঃ ছিঃ! কেন এতদিন তার একথা মনে হয়নি!

পাঁচনের বোতল বাগিয়ে নিয়ে টেনিদা ছাগলের দিকে পা বাড়ালো।

তারপর?

তারপরের গল্প তো আগেই বলে নিয়েছি।

———

বউবাজার দিয়ে আসতে আসতে ভীমনাগের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল টেনিদা। আর নড়তে চায় না। আমি বললুম, রাস্তার মাঝখানে অমন করে দাঁড়ালে কেন ? চল।

যেতে হবে ? নিতান্তই যেতে হবে ? কাতর দৃষ্টিতে টেনিদা তাকাল আমার দিকে ঃ প্যালা, তোর প্রাণ কি পাষাণে গড়া ? ওই দ্যাখ, থরে থরে সন্দেশ সাজানো রয়েছে, থালার ওপর সোনালি রঙের রাজভোগ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, রসের মধ্যে ডুব-সাঁতার কাটছে রসগোল্লা, পান্তো ! প্যালা রে—

আমি মাথা নেড়ে বললুম, চালাকি চলবে না। আমার পকেটে তিনটে টাকা আছে, ছোটমামার জন্যে মকরধ্বজ কিনতে হবে। অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল এখন—

টেনিদা শাঁ করে জিভে খানিকটা লালা টেনে নিয়ে বললে, সত্যি বলছি, বড্ড খিদে পেয়েছে রে ! আচ্ছা, দুটো টাকা আমায় এবার ধার দে, বিকেলে না হয় ছোটমামার জন্যে মকরধ্বজ—

কিন্তু ওসব কথায় ভোলবার বান্দা প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে নয়। টেনিদাকে টাকা ধার দিলে সে টাকা আদায় করতে পারে এমন খলিফা লোক দুনিয়ায় জন্মায়নি। পকেটটা শক্ত করে চেপে ধরে আমি বললুম, খাবারের দোকান চোখে পড়লেই তোমার পেট চুঁই চুঁই করে ওঠে—ওতে আমার সিম্প্যাথি নেই। তা ছাড়া এবেলা মকরধ্বজ না নিয়ে গেলে আমার ছেঁড়া কানটা সেলাই করে দেবে কে ? তুমি ?

রেলগাড়ির এঞ্জিনের মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেনিদা।

—ব্রাহ্মণকে সকালবেলা দাগা দিলি প্যালা—মরে তুই নরকে যাবি!

—যাই তো যাব। কিন্তু ছোটমামার কানমলা যে নরকের চাইতে ঢের মারাত্মক সেটা জানা আছে আমার! আর, কী আমার ব্রাহ্মণ রে! দেলখোস্ রেস্তোরাঁয় বসে আস্তো আস্তো মুরগির ঠ্যাং চিবুতে তোমায় যেন দেখিনি আমি!

—উঃ! সংসারটাই মরীচিকা—ভীমনাগের দোকানের দিকে তাকিয়ে শেষ বার দৃষ্টিভোজন করে নিলে টেনিদা ঃ নাঃ, বড়লোক না হলে আর সুখ নেই!

বিকেলে চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে সেই কথাই হচ্ছিল।

ক্যাবলা গেছে কাকার সঙ্গে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে, হাবুল সেন গেছে দাঁত তুলতে। কাজেই আছি আমরা দুজন। মনের দুঃখে দু ঠোঙা তেলেভাজা খেয়ে ফেলেছে টেনিদা। অবশ্য পয়সাটা আমিই দিয়েছি এবং আধখানা আলুর চপ ছাড়া আর কিছুই আমার বরাতে জোটেনি।

আমার পাঞ্জাবীর আস্তিনটা টেনে নিয়ে টেনিদা মুখটা মুছে ফেলল। তারপর বললে, বুঝলি প্যালা, বড়লোক না হলে সত্যিই আর চলছে না!

—বেশ তো, হয়ে যাও না বড়লোক—আমি উৎসাহ দিলুম।

—হয়ে যাও না বড়লোক! হওয়াটা একেবারে মুখের কথা কিনা! টাকা দেবে কে, শুনি? তুই দিবি?—টেনিদা ভেংচি কাটল। আমি মাথা নেড়ে জানালুম, না, আমি দেব না।

—তবে?

—লটারির টিকেট কেনো।—আমি উপদেশ দিলুম।

—ধ্যাত্তোর লটারির টিকিট! কিনে কিনে হয়রান হয়ে গেলুম, একটা ফুটো পয়সাও যদি জুটত কোনবার! লাভের মধ্যে টিকিটের জন্যে বাজারের পয়সা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লুম, বড়দা দুটো অ্যায়সা থাপ্পড় কষিয়ে দিলে! ওতে হবে না—বুঝলি? বিজ্‌নেস করতে হবে।

—বিজ্‌নেস!

—আলবৎ বিজ্‌নেস!—টেনিদার মুখ সঙ্কল্পে কঠোর হয়ে উঠল ঃ ওই যে কী বলে, হিতোপদেশে লেখা আছে না, বাণিজ্যে বসতি ইয়ে—মানে লক্ষ্মী! ব্যবসা ছাড়া পথ নেই—বুঝেছিস?

—তা তো বুঝেছি। কিন্তু তাতেও তো টাকা চাই।

—এমন বিজ্‌নেস করব যে নিজের একটা পয়সাও খরচ হবে না। সব পরস্মৈপদী—মানে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে।

—সে আবার কী বিজ্‌নেস?—আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলুম।

—হুঁ-হুঁ, আন্দাজ কর দেখি?—চোখ কুঁচকে মিটি মিটি হাসতে লাগল টেনিদা ঃ বলতে পারলি না তো? ওসব কি তোর মতো নিরেট মগজের কাজ? এমনি একটা মাথা চাই, বুঝলি?—সগৌরবে টেনিদা নিজের ব্রহ্মতালুতে দুটো টোকা দিলে।

—কেন ছলনা করছ? বলেই ফেল না—আমি কাতর হয়ে জানতে চাইলুম।

টেনিদা একবার চারদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখে নিলে, তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, ফিলিম্ কোম্পানি!

—অ্যাঁ ! !—আমি লাফিয়ে উঠলুম।

—গাধার মতো চ্যাঁচাস্‌নি—টেনিদা ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল ঃ সব প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। তুই গল্প লিখবি—আমি ডাইরেকট—মানে পরিচালনা করব। দেখবি চারিদিকে হৈ-হৈ পড়ে যাবে !

—ফিলিমের কী জানো তুমি ?—আমি জানতে চাইলুম।

—কে-ই বা জানে ?—টেনিদা তাচ্ছিল্য-ভরা একটা মুখভঙ্গি করলে ঃ সবাই সমান—সকলের মগজেই গোবর। তিনটে মারামারি, আটটা গান আর গোটাকতক ঘর বাড়ি দেখালেই ফিলিম হয়ে যায় ! টালিগঞ্জে গিয়ে আমি শুটিং দেখে এসেছি তো।

—কিন্তু তবুও—

—ধ্যাৎ, এই একটা গাড়ল !—টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, সত্যি সত্যিই কি আর ছবি তুলব আমরা ! ওসব ঝামেলার মধ্যে কে যাবে !

—তাহলে ?

—শেয়ার বিক্রি করব। বেশ কিছু শেয়ার বিক্রি করতে পারলে—বুঝলি তো ?—টেনিদা চোখ টিপল ঃ দ্বারিক, ভীমনাগ, দেলখোস, কে. সি, দাস—

এইবার আমার নোলায় জল এসে গেল। চুক্‌চুক্ করে বললুম—থাক্, থাক্, আর বলতে হবে না !

পরদিন গোটা পাড়াটাই পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেল ঃ

“দি ভজহরি ফিল্‌ম্ কর্পোরেশন”

আসিতেছে—আসিতেছে

রোমাঞ্চকর বাণীচিত্র

“বিভীষিকা” !!

পরিচালনা ঃ ভজহরি মুখোপাধ্যায় (টেনিদা)

কাহিনী ঃ প্যালারাম বন্দ্যোপাধ্যায়

তার নিচে ছোট ছোট হরফে লেখা ঃ

সর্বসাধারণকে কোম্পানির শেয়ার কিনিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য মাত্র আট আনা। একত্রে তিনটি শেয়ার কিনিলে মাত্র এক টাকা।

এর পরে একটা হাত এঁকে লিখে দেওয়া হয়েছে ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য—শেয়ার কিনিলে প্রত্যেকেরই বইতে অভিনয়ের চান্স দেওয়া হইবে। এমন সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। মাত্র অল্প শেয়ার আছে, এখন না কিনিলে পরে পস্তাইতে হইবে। সন্ধান করুন—১৮নং পটলডাঙা স্ট্রীট, কলিকাতা।

আর, বিজ্ঞাপনের ফল যে কত প্রত্যক্ষ হতে পারে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাতে-নাতে তার প্রমাণ মিলে গেল। এমন প্রমাণ মিলল যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

অত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা আমরা আশা করিনি। টেনিদাদের অত বড় বাড়িটা একেবারে খালি, বাড়িশুদ্ধু সবাই গেছে দেওঘরে হাওয়া বদলাতে। টেনিদার ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে, তাই একা রয়ে গেছে বাড়িতে, আর আছে চাকর বিষ্টু।

তাই দিব্যি আরাম করে বসে আমরা তে-তলার ঘরে রেডিয়ো শুনছি আর পাঁটার ঘুগনি খাচ্ছি, এমন সময় বিষ্টু খবর নিয়ে এল মূর্তিমান একটি ভগ্নদূতের মতো।

বিষ্টুর বাড়ি চাটগাঁয়। হাঁই-মাই করে নাকি সুরে কী যে বলে ভালো বোঝা যায় না। তবে যেটুকু বোঝা গেল, শুনে আমরা আঁতকে উঠলুম। গলায় পাঁটার ঘুগনি বেধে গিয়ে মস্ত একটা বিষম খেলো টেনিদা।

বিষ্টু জানালো ঃ 'আঁড়িত্ ডাঁহাইত হইড়্ছে' (বাড়িতে ডাকাত পড়েছে) !

বলে কী ব্যাটা ! পাগল না পেট-খারাপ ! ম্যাড়া না মিরগেল ! এই ভরদুপুর বেলায় একেবারে কলকাতার বুকের ভেতরে ডাকাত পড়বে কী রকম !

বিষ্টু বিবর্ণ মুখে জানালো ঃ নিছে হাঁসি দেইক্যা যান (নিচে এসে দেখে যান)।—আমি ভাবছিলাম খাটের তলাটা নিরাপদ জায়গা কি না, কিন্তু টেনিদা এমন এক বাঘা হাঁকার ছাড়লে যে আমার পালা-জ্বরের পিলেটা দস্তুরমতো হক্‌চকিয়ে উঠল ।

—কাপুরুষ ! চলে আয় দেখি—একটা বোম্বাই ঘুষি হাঁকিয়ে ডাকাতের নাক থ্যাবড়া করে দি ! আমি নিতান্ত গোবেচারা প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে, সিং মাছের ঝোল খেয়ে প্রাণটাকে কোনমতে ধরে রেখেছি, ওসব ডাকাত-ফাকাতের ঝামেলা আমার ভালো লাগে না। বেশ তো ছিলাম, এসব ভজঘট ব্যাপার কেন রে বাবা ! আমি বলতে চেষ্টা করলুম, এই—এই মানে, আমার কেমন পেট কামড়াচ্ছে—

—পেট কামড়াচ্ছে ! টেনিদা গর্জন করে উঠল ঃ পাঁঠার ঘুগনি সাবাড় করার সময় তো সে কথা মনে ছিল না দেখছি ! চলে আয় প্যালা, নইলে তোকেই আগে—

কথাটা টেনিদা শেষ করল না, কিন্তু তার বক্তব্য বুঝতে বেশি দেরি হল না আমার। 'জয় মা দুর্গা,—কাঁপতে কাঁপতে আমি টেনিদাকে অনুসরণ করলুম ।

কিন্তু না—ডাকাত পড়েনি ।

পটলডাঙার মুখ থেকে কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত 'কিউ' । কে নেই সেই কিউতে ? স্কুলের ছেলে, মোড়ের বিড়িওয়ালা,

পাড়ার ঠিকে ঝি, উড়ে ঠাকুর, এমনকি যমদূতের মত দেখতে একজোড়া ভীমদর্শন কাবুলিওয়ালা।

আমরা সামনে এসে দাঁড়াতেই গগনভেদী কোলাহল উঠল ঃ

—আমি শেয়ার কিনব—

—এই নিন মশাই আট আনা পয়সা—

ঝি বললে, ওগো বাছারা, আমি একটা ট্যাকা এনেছি। আমাকে তিনখানা শেয়ার দাও—আর একটি হিরোইনের চান্স দিয়ো—

পাশের বোর্ডিংটার উড়ে ঠাকুর বললে, আমিও আষ্টো গণ্ডা পয়সা আনুচি—

সকলের গলা ছাপিয়ে কাবুলিওয়ালা রুদ্র কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল ঃ এঃ বাব্বুঃ, এক রুপেয়া লায়া, হাম্‌কো ভি চান্স চাহিয়ে—

তারপরেই সমস্বরে চিৎকার উঠল ঃ চান্স—চান্স !

চিৎকারের চোটে আমার মাথা ঘুরে গেল—দু-হাতে কান চেপে আমি বসে পড়লুম।

আশ্চর্য, টেনিদা দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে রইল একেবারে শান্ত স্তব্ধ বুদ্ধদেবের মতো। শুধু তাই নয়, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত একটা দাঁতের ঝলক বয়ে গেল তার—মানে হাসল।

তারপর বললে, হবে, হবে, সকলেরই হবে।—বরাভয়ের মতো একখানা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, প্রত্যেককেই চান্স দেওয়া হবে। এখন চাঁদেরা আগে সুড়-সুড় করে পয়সা বের করো দেখি ! খবর্দার, অচল আধুলি চালিয়ো না, —তা হলে কিন্তু—

—জয় হিন্দ্—জয় হিন্দ্—

ভিড়টা কেটে গেলে টেনিদা দু-হাত তুলে নাচতে শুরু করে

দিলে। তারপর ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসতে গিয়ে চেয়ার-শুদ্ধই চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল।

আমি বললুম, আহা-হা—

কিন্তু টেনিদা উঠে পড়েছে ততক্ষণে। আমার কাঁধের ওপর এমন একটা অতিকায় থাবড়া বসিয়ে দিলে যে, আমি আর্তনাদ করে উঠলুম।

—ওরে প্যালা, আজ দুঃখের দিন নয় রে, বড় আনন্দের দিন! মার দিয়া কেল্লা! ভীমনাগ, দ্বারিক ঘোষ, চাচার হোটেল, দেলখোস—আঃ!

যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে আমিও বললুম, আঃ!

—আয়, গুণে দেখি—এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত আবার হাসির ঝলক উলসে উঠল।

রোজগার নেহাত মন্দ হয়নি। গুণে দেখি ছাব্বিশ টাকা বারো আনা।

—বারো আনা?—টেনিদা ভ্রূকুটি করলে, বারো আনা কী করে হয়? আট আনা আর এক টাকা করে হলে—উহু! নিশ্চয় ডামাডোলের মধ্যে কোন ব্যাটা চার গণ্ডা পয়সা ফাঁকি দিয়েছে—কী বলিস?

আমি মাথা নেড়ে জানালুম আমারও তাই মনে হয়।

—উঃ—দুনিয়ায় সবই জোচ্চোর! একটাও কি ভালো লোক থাকতে নেই রে? দিলে সকাল বেলাটায় বামুনের চার-চার আনা পয়সা ঠকিয়ে!—টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: যাক, এতেও নেহাত মন্দ হবে না। দেলখোস, ভীমনাগ, দ্বারিক ঘোষ—

আমি তার সঙ্গে জুড়ে দিলুম, চাচার হোটেল, কে. সি. দাস—

টেনিদা বললে, ইত্যাদি—ইত্যাদি। কিন্তু শোন্ প্যালা,

একটা কথা আগেই বলে রাখি। প্ল্যানটা আগাগোড়াই আমার। অতএব বাবা সোজা হিসেব—চৌদ্দ আনা—তু আনা !

আমি আপত্তি করে বললুম, অ্যাঁ, তা কী করে হয় ?

টেনিদা সজোরে টেবিলে একটা কিল মেরে গর্জন করে উঠল, হুঁ, তাই হয় ! আর তা যদি না হয়, তা হলে তোকে সোজা দোতলার জানলা গলিয়ে নিচে ফেলে দেওয়া হয় ; সেটাই কি তবে ভালো হয় ?

আমি কান চুলকে জানালুম, না, সেটা ভালো হয় না।

—তবে চল্— গোটাকয়েক মোগলাই পরোটা আর কয়েক ডিশ ফাউল কারি খেয়ে ভজহরি ফিল্ম্ কর্পোরেশনের মহরত করে আসি।—টেনিদা ঘর-ফাটানো একটা পৈশাচিক অট্টহাসি করে উঠল। হাসির শব্দে ভেতর থেকে ছুটে এলো বিষ্টু। খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললে, ছুটোবাবুর মাথা হাঁড়াপ (খারাপ) অইচে !

কিন্তু—দিন কয়েক বেশ কেটে গেল। দ্বারিকের রাজভোগ আর চাচার কাটলেট খেয়ে শরীরটাকে দস্তুরমতো ভালো করে ফেলেছি তুজনে। কে. সি. দাশের রসোমালাই খেতে খেতে তুজনে ভাবছি—আবার নতুন কোনো একটা প্ল্যান করা যায় কি না, এমন সময়—

দোরগোড়ায় যেন বাজ ডেকে উঠল !

সেই যমদূতের মতো একজোড়া কাবুলিওয়ালা। অতিকায় জাব্বা-জোব্বা আর কালো চাপদাড়ির ভেতর দিয়ে যেন জিঘাংসা ফুটে বেরোচ্ছে।

আমরা ফিরে তাকাতেই লাঠি ঠুকল ঃ এঃ বাব্বু ঃ—রুপেয়া কাঁহা ? হাম্‌লোগ কা চান্স কিধর ?

—অ্যাঁঃ!—টেনিদার হাত থেকে রসোমালাইটা বুক-পকেটের ভেতর পড়ে গেলঃ প্যালা রে, সেরেছে!

—সারবেই তো!—আমি বললুম, তবে আমার সুবিধে আছে। চৌদ্দ আনা—দু আনা। চৌদ্দ আনা ঠ্যাঙানি তোমার, মানে স্রেফ্ ছাতু করে দেবে। দু আনা খেয়ে আমি বাঁচলেও বেঁচে যেতে পারি।

কাবুলিওয়ালা আবার হাঁকলঃ—এঃ ভজহরি বাব্বু—বাহার তো আও—

বাহার আও—মানেই নিমতলা যাও! টেনিদা এক লাফে উঠে দাঁড়াল, তারপর সোজা আমাকে বগলদাবা করে পাশের দরজা দিয়ে অন্যদিকে।

—ওগো ভালোমানুষের বাছারা, আমার ট্যাকা কই, চান্স কই?

ঝি। হাতে আঁশবটি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

—আমারো চান্সো মিলিবো কি না?—উড়ে ঠাকুর ভাত রাঁধবার খুন্তিটাকে হিংস্রভাবে আন্দোলিত করল।

—জোচ্চুরি পেয়েচেন স্যার—আমরা শ্যামবাজারের ছেলে—আস্তিন গুটিয়ে একদল ছেলে তাড়া করে এল।

এক মুহূর্ত আমাদের চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন ঘুরতে লাগল। তারপরেই—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!' আমাকে কাঁধে তুলে টেনিদা একটা লাফ মারল। তারপর আমার আর ভালো করে জ্ঞান রইল না। শুধু টের পেলুম, চারদিকে একটা পৈশাচিক কোলাহলঃ 'চোট্টা—চোট্টা—ভাগ যাতা—' আর বুঝতে পারলুম—যেন পাঞ্জাব মেলে চড়ে উড়ে চলেছি!

ধপাৎ করে মাটিতে পড়তেই আমি হাঁউমাউ করে উঠলুম।

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, হাওড়া স্টেশন। রেলের একটা এঞ্জিনের মতোই হাঁপাচ্ছে টেনিদা।

বললে, হুঁ হুঁ বাবা, পাঁচশো মিটার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ান—আমাকে ধরবে ওই ব্যাটারা! যা প্যালা—পকেটে এখনো বারো টাকা চার আনা রয়েছে, ঝট্ করে দু-খানা দেওঘরের টিকিট কিনে আন্। দিল্লি এক্সপ্রেস এখুনি ছেড়ে দেবে।

ক্যামোফ্লেজ

চাটুজ্জেদের রোয়াকে গল্পের আড্ডা জমেছিল। আমি, ক্যাবলা, হাবুল সেন, আর সভাপতি আমাদের পটলডাঙার টেনিদা। একটু আগেই ক্যাবলার পকেট হাতড়ে টেনিদা চারগণ্ডা পয়সা রোজগার করে ফেলেছে, তাই দিয়ে আমরা তারিয়ে তারিয়ে কুল্‌পি বরফ খাচ্ছিলাম।

শুধু হাঁড়ির মতো মুখ করে ক্যাবলা বসে আছে। হাতের শালপাতাটার ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় কুলপির রস গড়িয়ে পড়ছে, ক্যাবলা খাচ্ছে না।

টেনিদা হঠাৎ তার বাঘা গলায় হুঙ্কার ছাড়লে, এই ক্যাবলা, খাচ্ছিস না যে ?

ক্যাবলার চোখে তখন জল আসবার জো। সে জবাব দিলে না, শুধু মাথা নাড়ল।

—খাবি না ? তবে না খাওয়াই ভালো। কুলপি খেলে ছেলেপুলের পেট খারাপ করে—বলতে না বলতেই থাবা দিয়ে টেনিদা ক্যাবলার হাত থেকে কুলপিটা তুলে নিলে, তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে সোজা শ্রীমুখের গহ্বরে।

ক্যাবলা বললে, অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—

—অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ ! এর মানে কী ? বলি, মানেটা কী হল এর ?—টেনিদা বজ্রগর্ভ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

ক্যাবলা এবারে কেঁদে ফেলল : আমার চার আনা পয়সা তুমি মেরে দিলে, অথচ আমি ভাবছিলাম সিনেমা দেখতে যাব—একটা ভালো যুদ্ধের বই—

—যুদ্ধের বই—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল : বলি যুদ্ধের বইতে কী দেখবার আছে র‍্যা ? খালি দুড়ুম দাড়ুম, খালি ধূম-ধাড়াক্কা, আর খানিকটা বাহাদুর কা খেল্! যুদ্ধের গল্প যদি শুনতে চাস তবে শোন্ আমার কাছে।

—তুমি যুদ্ধের কী জানো ?—আমি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম।

—কী বললি প্যালা ?—টেনিদার হুঙ্কারে আমার পালাজ্বরের পিলে নেচে উঠল : আমি জানিনে ? তবে কে জানে শুনি ? তুই ?

—না, না, আমি আর জানব কোত্থেকে !—আমি তাড়াতাড়ি বললাম : বাসকপাতার রস খাই আর পালাজ্বরে ভুগি, ওসব যুদ্ধ ফুদ্ধ আমি জানব কেমন করে ? তবে বলছিলাম কিনা—টেনিদার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি সোজা মুখে ইস্কুপ এঁটে দিলাম।

—কিছুই বলছিলি না। মানে, কখনোই কিছু বলবি না।—টেনিদা চোখ দিয়েই যেন আমাকে একটা পেল্লায় রদ্দা কষিয়ে দিলে : ফের যদি যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিস তবে ক্রুদ্ধ হয়ে নাকের ডগায় এমন একটি মুগ্ধবোধ বসিয়ে দোব যে, সোজা বুদ্ধদেব হয়ে যাবি—বুঝলি ? মানে মিউজিয়ামে নাকভাঙা বুদ্ধদেব দেখেছিস তো, ঠিক সেইরকম।

আতঙ্কে আমি একেবারে ল্যাম্প-পোস্ট হয়ে গেলাম।

টেনিদা গলা ঝেড়ে বললে, আমি যখন যুদ্ধে যাই—মানে বার্মা ফ্রণ্টে যেবার গেলাম—

খুক-খুক করে একটা চাপা আওয়াজ। হাবুল সেন হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।

—হাসছিস যে হাবলা ?—টেনিদা এবার হাবুলের দিকে মনোনিবেশ করলে।

মুহূর্তে হাবুল ভয়ে পান্‌সে মেরে গেল। তোতলিয়ে বললে, এই ন্-ন্-না, ম্-মানে, ভাবছিলাম তুমি আবার কবে যু-যু-যুদ্ধে গেলে—

দারুণ উত্তেজনায় টেনিদা রোয়াকের সিমেণ্টের উপর একটা কিল বসিয়ে দিয়ে উঃ উঃ করে উঠল। তারপর সেটাকে সামলে নিয়ে চিৎকার করে বললে, গুরুজনের মুখে মুখে তক্কো! ওইজন্যেই তো দেশ আজো পরাধীন! বলি, আমি যুদ্ধে যাই না যাই তাতে তোর কী? গল্প চাস তো শোন্, নইলে স্রেফ ভাগাড়ে চলে যা। তোদের মতো বিশ্ববকাটকে কিছু বলতে যাওয়াই ঝকমারি!

—না, না, তুমি বলে যাও, আর আমরা তর্ক করব না।··· হাবুল সভয়ে আত্মসমর্পণ করল।

টেনিদা কুলপির শালপাতাটা শেষ বার খুব দরদ দিয়ে চেটে নিলে, তারপর সেটাকে তালগোল পাকিয়ে ক্যাবলার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, তবে শোন্—

আমি তখন যুদ্ধ করতে করতে আরাকানের এক দুর্গম পাহাড়ী জায়গায় চলে গেছি। জাপানীদের পেলেই এমন করে ঠেঙিয়ে দিচ্ছি যে ব্যাটারা 'ফুজিয়ামা' 'টুজিয়ামা' বলে ল্যাজ তুলে পালাতে পথ পাচ্ছে না। তেরো নম্বর ডিভিশনের আমি তখন কম্যান্‌ডার—তিন তিনটে ভিক্টোরিয়া ক্রস পেয়ে গেছি।

ক্যাবলা ফস্ করে জিজ্ঞেস করলে, সে ভিক্টোরিয়া ক্রসগুলো কোথায়?

—অত খোঁজে তোর দরকার কী? বলি গল্প শুনবি, না বাগড়া দিবি বল্‌তো?

—যেতে দাও, যেতে দাও। অমৃতং ক্যাবলা-ভাষিতং। তুমি গল্প চালিয়ে যাও টেনিদা—হাবুল মন্তব্য করলে।

—যুদ্ধ করতে করতে সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলাম—যার নাম তোরা কাগজে খুব দেখেছিস। নামটা ভুলে যাচ্ছি—সেই যে কিসের একটা ডিম—

আমি বললাম, হাঁসের ডিম?

টেনিদা বললে, তোর মাথা!

ক্যাবলা বললে, তবে কি মুরগির ডিম?

টেনিদা বললে, তোর মুণ্ডু!

আমি আবার বললাম, তবে নিশ্চয় ঘোড়ার ডিম। তাও না? কাকের ডিম, বকের ডিম, ব্যাঙের ডিম—

ক্যাবলা বললে, ঠিক, ঠিক, আমার যেন মনে পড়েছে। বোধ হয় টিকটিকির ডিম—

—অ্যাই, অ্যাই মনে পড়েছে!—টেনিদা এমনভাবে ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দিলে যে ক্যাবলা আর্তনাদ করে উঠল: ঠিক ধরেছিস, টিড্ডিম!···হ্যাঁ—যা বলছিলাম। টিড্ডিমে তখন পেল্লায় যুদ্ধ হচ্ছে। জাপানী পেলেই পটাপট মেরে দিচ্ছি। চা খেতে খেতে জাপানী মারছি, ঝিমুতে ঝিমুতে জাপানী মারছি, এমন কি যখন ঘুমিয়ে নাক ডাকাচ্ছি তখনো কোন্ না দু-চারটে জাপানী মেরে ফেলছি!

—নাক ডাকাতে ডাকাতে জাপানী মারা! সে আবার কী রকম?—আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না।

—হে-হে-হে—টেনিদা একগাল হাসল: সে ভারী ইন্টারেস্টিং! আমার এই কুতুব-মিনারের মতো নাকই দেখেছিস, এর ডাক তো কখনো শুনিস নি! একেবারে যাকে বলে রণ-ডম্বরু! ওইজন্যেই তো মেজকাকা গেল বছর বিলিতী ইঞ্জিনিয়ার ডেকে আমার ঘরটা সাউণ্ড প্রুফ করিয়ে নিলে, যাতে বাইরে থেকে ওর

আওয়াজ কারো কানে না যায়। তা ছাড়া পাড়ার লোকেও কর্পোরেশনে লেখালেখি করছিল কা! একদিন তো পুলিশ এসে বাড়ি তছনছ—রোজ রাত্রে এ বাড়িতে মেশিন গানের আওয়াজ পাওয়া যায়, নিশ্চয় এখানে বে-আইনি অস্ত্রের কারখানা আছে। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড! যাক সে গল্প আর একদিন হবে।

হ্যাঁ—গল্পটা বলি। রোজ রাত্রে ট্রেঞ্চ থেকে আমার নাকের এমনি আওয়াজ বেরুত যে আর সেন্ট্রি দরকার হত না। জাপানীরা ভাবত, সারা রাত বুঝি মেশিন গান চলছে, তাই পাহাড়ের ওপার থেকে তারা আর নাক গলাবার ভরসা পেত না। আমাদের যিনি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ছিলেন—নাম বোধহয় মিস্টার বোগাস্—তাঁর মগজে শেষে একটা চমৎকার বুদ্ধি গজালো। তিনি একটা লোক রাখলেন। সে ব্যাটা সারারাত আমার পাশে বসে থাকত আর আমার নাকে একটার পর একটা শিসের গুলি, পাথরের টুকরো যা পারত বসিয়ে দিত। আধ সেকেণ্ডের মধ্যেই দোনলা বন্দুকের দুটো গুলির মতো সেগুলো ছিটকে বেরিয়ে যেত—কত জাপানী যে ওতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার হিসেব নেই।

আমি বিড়-বিড় করে আওড়ালাম ঃ সব গাঁজা!

টেনিদা বিদ্যুৎবেগে আমার দিকে ফিরল ঃ কী বললি?

—না, না, বলছিলাম, এই আর কি—আমি সামলে গেলাম ঃ কী মজা!

—হ্যাঁ, সে খুব মজার ব্যাপার! ওইজন্যেই তো একটা ভিক্টোরিয়া ক্রস পাই আমি—টেনিদা তার দুর্দান্ত নাকটাকে গণ্ডারের খাঁড়ার মতো সগৌরবে আকাশের দিকে তুলে ধরল।

—তারপর ? এই নাকের জোরেই বুঝি যুদ্ধজয় হল ?—হাবুল জানতে চাইল।

—অনেকটা। জাপানীদের যখন প্রায় নিকেশ করে ছেড়েছি, তখন হঠাৎ একটা বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেল। আর সেইটেই হল আমাদের আসল গল্প।

—বলো, বলো—আমরা তিনজনে সমস্বরে প্রার্থনা জানালাম।

টেনিদা আবার শুরু করল : আমার একটা কুকুর ছিল। তোদের বাংলা দেশের ঘিয়ে-ভাজা নেড়ি কুত্তো নয়, একটা বিরাট গ্রে-হাউণ্ড। যেমন তার গাঁক-গাঁক ডাক, তেমনি তার বাঘা চেহারা। আর কী তালিম ছিল তার! ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে দু পায়ে খাড়া হয়ে হাঁটতে পারত। বেচারা অপঘাতে মারা গেল। দুঃখ হয় কুকুরটার জন্যে, তবে বামুনের জন্যে মরেছে, ব্যাটা নির্ঘাত স্বর্গে যাবে।

—কী করে মরল ?—হাবুল প্রশ্ন করল।

—আরে দাঁড়া না কাঁচকলা! যত সব ব্যস্তবাগীশ, আগে থেকেই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে গল্পটা মাটি করে দিচ্ছে!

—যাক, যা বলছিলাম। একদিন বিকেলবেলা, হাতে তখন কোন কাজ নেই—আমি সেই কুকুরটাকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরিয়েছি। পাহাড়ী জঙ্গলে বেড়াচ্ছি হাওয়া খেয়ে। দু-দিন আগেই জাপানী ব্যাটারা ওখান থেকে সরে পড়েছে, কাজেই ভয়ের কোন কারণ ছিল না। কুকুরটা আগে আগে যাচ্ছে, আর আমি চলেছি পেছনে পেছনে।

কিন্তু ওই বেঁটে ব্যাটাদের পেটে পেটে শয়তানি! দিলে এই টেনি শর্মাকেই একটা লেঙ্গি কষিয়ে। যেতে যেতে দেখি, পাহাড়ের এক নিরিবিলি জায়গায় এক দিব্যি আমগাছ। যত না পাতা, তার

চাইতে ঢের বেশি পাকা আম তাতে। একেবারে কাশীর ল্যাংড়া! দেখলে নোলা শক্‌শক্ করে ওঠে!

—আরাকানের পাহাড়ে কাশীর ল্যাংড়া!—আমি আবার কৌতূহল প্রকাশ করে ফেললাম।

—ছাখ্, প্যালা, ফের বাধা দিয়েছিস তো একটা চাঁটি হাঁকিয়ে—

—আহা যেতে দাও—যেতে দাও—হাবুল ঢাকাই ভাষায় বললে, পোলাপান!

—পোলাপান!—টেনিদা গর্জে উঠল: আবার বকর-বকর করলে একেবারে জলপান করে খেয়ে ফেলব—এই বলে দিলাম, হুঁঃ!

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। খাস কাশীর ল্যাংড়া! কুকুরটা আমাকে একটা চোখের ইঙ্গিত করে বললে, গোটা-কয়েক আম পাড়ো।

ক্যাবলা বললে, কুকুরটা আম খেতে চাইল?

—চাইলই তো। এ তো আর তোদের এঁটুলি-কাটা নেড়ি কুত্তো নয়, সেরেফ বিলিতি গ্রে-হাউণ্ড। আম তো আম! কলা, মুলো, গাজর, উচ্ছে, নালতে শাক, সজনেডাঁটা সবই তরিবৎ করে খায়। আমি আম পাড়তে উঠলাম। আর যেই ওঠা—টেনিদা থামল।

—কী হল?

—যা হল তা ভয়ঙ্কর। আমগাছটা হঠাৎ জাপানী ভাষায় 'ফুজিয়ামা-টুজিয়ামা' বলে ডালপালা দিয়ে আমায় সাপটে ধরলে। তারপরেই বীরের মতো কুইক্ মার্চ। তিন-চারটে গাছও তার সঙ্গে সঙ্গে 'নিপ্পন বান্‌জাই' বলে হাঁটা আরম্ভ করলে।

—সেকি!—আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম: গাছটা তোমাকে জাপটে ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলে!

—করলে তো! আরে, গাছ কোথায়! স্রেফ ক্যামোফ্লেজ।

—ক্যামাফ্লেজ মানে?

—ক্যামোফ্লেজ মানে জানিসনে? কোথাকার গাড়োল সব! টেনিদা একটা বিকট মুখভঙ্গি করে বলল: মানে, ছদ্মবেশ। জাপানীরা ও ব্যাপারে দারুণ এক্সপার্ট ছিল। জঙ্গলের মধ্যে কখনো গাছ সেজে, কখনো ঢিবি সেজে ব্যাটারা বসে থাকত। তারপর সুবিধে পেলেই—ব্যস্!

—সর্বনাশ! তারপর?

—তারপর?—টেনিদা একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল: তারপর যা হওয়ার তাই হয়ে গেল।

—কী হল?—আমরা রুদ্ধশ্বাসে বললাম, কী করলে তারপর?

—আমাকে ধরে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল। ক্যামোফ্লেজকে খুলে ফেললে, তারপর বত্রিশটা কোদালে কোদালে দাঁত বের করে পৈশাচিক হাসি হাসল। কোমর থেকে ঝক্‌ঝকে একটা তরোয়াল বের করে বললে, মিস্টার, উই উইল কাট্ ইউ!

—কী ভয়ানক!—ক্যাবলা আর্তনাদ করে বললে, তুমি বাঁচলে কী করে?

—আর কী বাঁচা যায়?—বললে, 'নিপ্পন বানজাই'—মানে, জাপানের জয় হোক। তারপর তলোয়ারটা ওপরে তুলে—

হাবুল অস্ফুটস্বরে বললে, তলোয়ারটা তুলে?

—ঝাঁ করে এক কোপ! সঙ্গে সঙ্গে আমার মুণ্ডু নেমে গেল। তারপর রক্তে রক্তময়!

—ওরে বাবা!—আমরা তিনজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম: তবে তুমি কি তাহলে—

—ভূত ? দূর গাধা, ভূত হব কেন ? ভূত হলে কারু কি ছায়া পড়ে ? আমি জলজ্যান্ত বেঁচেই আছি—কেমন ছায়া পড়েছে—দেখতে পাচ্ছিস না ?

আমাদের তিনজনের মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

হাবুল অতি কষ্টে বলতে পারল ঃ মুণ্ডু কাটা গেল, তাহলে তুমি বেঁচে রইলে কী করে ?

—হুঁ-হুঁ, আন্দাজ কর দেখি—টেনিদা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটি-মিটি হাসতে লাগল।

—কিছু বুঝতে পারছি না—কোন মতে বলতে পারলাম আমি। মনে মনে ততক্ষণ রাম নাম জপ করতে শুরু করেছি। টেনিদা বলে ভুল করে তাহলে কি এতকাল একটা স্কন্ধকাটার সঙ্গে কারবার করছি ?

—দূর গাধা—টেনিদা বিজয়গর্বে বললে, কুকুরটা পালিয়ে এল যে !

—তাতে কী হল ?

—তবু বুঝলি না ? আরে এখানেও যে ক্যামোফ্লেজ !

—ক্যামোফ্লেজ !

—আরে ধ্যাৎ। তোদের মগজে বিলকুল সব ঘুঁটে, এক ছটাকও বুদ্ধি নেই ! মানে আমি টেনি শর্মা—চালাকিতে অমন পাঁচশো জাপানীকে কিনতে পারি। মানে আমি কুকুর সেজে-ছিলাম, আর কুকুরটা হয়েছিল আমি। বেঁটে ব্যাটাদের শয়তানী জানতাম তো ! ওরা যখন আমার—মানে কুকুরটার মাথা কেটে ফেলেছে, সেই ফাঁকে লেজ তুলে আমি হাওয়া !

আর তারপরেই পেলাম তিন নম্বর ভিক্টোরিয়া ক্রসটা।

টেনিদা পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে আমাদের সকলের বোকাটে মুখগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর একটা পৈশাচিক হুঙ্কার ছাড়ল ঃ দু আনা পয়সা বার কর্ প্যালা, ওই গরম গরম চানাচুর যাচ্ছে—

———

টেনিদা বললে, প্যালা, মেরে দিয়েছি কেল্লা! চল একটু মিষ্টি-মুখ করে আসা যাক।

মিষ্টিমুখ করতে আপত্তি আছে এমন অপবাদ প্যালারামের শত্রুরাও দিতে পারবে না। তবে টেনিদার সঙ্গে যেতেই আপত্তি আছে একটু। ওর মিষ্টিমুখ মানেই আমার পকেট ফাঁক। টেনিদা যখনই বলেছে, চল প্যালা—বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে তোকে জলযোগ করিয়ে আনি—তখনই আমার কমসে-কম পাঁচটি করে টাকা স্রেফ বরবাদ। মানে রাজভোগগুলো ও-ই খেয়েছে—আর আমি বসে বসে দু-একটা যা খেতে চেষ্টা করেছি থাবা দিয়ে সেগুলো কেড়ে নিয়ে বলেছে, এ-সব ছেলেপুলের খেতে নেই— পেট খারাপ করে।

অতএব গেলাস দুই জল খেয়েই আমায় উঠে আসতে হয়েছে। একেবারে খাঁটি জলযোগ যাকে বলে। তাই টেনিদার প্রস্তাব কানে যেতেই আমি তিন পা পেছিয়ে গেলাম।

বললাম, আমার শরীর ভালো নেই—আমি এখন মামাবাড়ি যাচ্ছি।

টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটাকে খাড়া করে বললে, শরীর ভালো নেই তো মামাবাড়ি যাচ্ছিস কেন? তোর মামা কি ভেটিনারি সার্জন যে তোর মতো ছাগলকে পটাৎ পটাৎ করে ইনজেকশন দেবে? বেশি পাকামি করিসনি প্যালা—চল আমার সঙ্গে।

—সত্যি বলছি টেনিদা—

কিন্তু সাত্যি মিথ্যে কিছুই টেনিদা আমায় বলতে দিলে না। আমার পিঠে পনেরো সের ওজনের একটা চাঁটি বসিয়ে বললে, কেন বচ্ছরকার প্রথম দিনটিতে একরাশ মিথ্যে বলছিস প্যালা? কোন ভাবনা নেই, বুঝলি? তোর এক পয়সাও খরচ নেই —সব পরস্মৈপদী।

—পরস্মৈপদী কে খাওয়াবে? আমাদের মতো অপো-গণ্ডকে খাওয়াবার জন্যে কার মাথা-ব্যথা পড়েছে?

টেনিদা বললে, তোর মগজে আগে গোবর ছিল, এখন একেবারে নিটোল ঘুঁটে। ওরে গর্দভ, আজ যে হালখাতা! দোকানে গেলেই খাওয়াবে।

—কিন্তু আমাদের খাওয়াবে কেন? নেমন্তন্ন করেনি তো?

—সেই ব্যবস্থাই তো করেছি। টেনিদা হেঁ-হেঁ করে হেসে বললে, এই দ্যাখ—

বলেই পকেট থেকে বের করলে একগাদা লাল-নীল হালখাতার চিঠি।

—এ-সব চিঠি পেলে কোথায়?

—আরে আমার চিঠি নাকি? সব কুট্টিমামার।

—কুট্টিমামা!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ—সেই যে গজগোবিন্দ হালদার? তোকে বলিনি? সেই যে ভালুকের নাক টিকের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল? সেই কুট্টিমামা। তার অনেক এসেছে। তাই থেকেই কয়েকটা হাত-সাফাই করেছি আমি। বিশেষ করে এইটে—

বলে একটা লাল রঙের চিঠি এগিয়ে দিলে।

তাতে 'নতুন খাতা' 'মহরৎ'-টহরৎ এইসব বাঁধা গতের তলায় কালি দিয়ে লেখা আছে ঃ প্রিয় গজগোবিন্দবাবু, অবশ্য আসিবেন।

মাংস, পোলাও, দই, রসগোল্লার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। ইতি আপনাদের চন্দ্রকান্ত চাকলাদার—প্রোপ্রাইটার নাসিকামোহন নস্য কোম্পানি।

টেনিদার চোখ চক্‌চক্ করে উঠল : দেখছিস তো খঁ্যাটের ব্যবস্থাখানা? এমন সুযোগ ছাড়তে নেই। তবে একা খেয়ে সুবিধে হবে না, তাই তোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইছি।

—কিন্তু টেনিদা—

টেনিদা মুখটাকে গণ্ডারের মতো করে বললে, আবার কিন্তু কী রে! পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খেয়ে খেয়ে তুই দেখছি একটা পটোলের দোলমা হয়ে গেছিস! মাংস পোলাও খেতে পাবি, তাতে অত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন?

—আমি বলছিলাম, হালখাতায় গেলে নাকি টাকা-ফাকা দিতে হয়—

—না দিলেই হল! দোকানদারেরা এ-সময় ভারি জব্দ থাকে—জানিস তো? যত টাকাই পাওনা থাক না কেন—মুখ ফুটে চাইতে পারে না। যত খুশি খেয়ে আয়, হাসিমুখে বলবে, আর দুটো মিহিদানা দেব স্যার? চল্ প্যালা—এমন মওকা ছাড়তে নেই!

ভেবে দেখলাম, ছাড়া উচিত নয়। আমি টেনিদার সঙ্গই নিলাম।

প্রথমে দু-একটা খুচরো খাওয়া-দাওয়া হল।

এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ—দুটো একটা মিষ্টি—এইসব। দোকানদারেরা অবশ্য আড়চোখে টাকার থালার দিকে তাকিয়ে দেখছিল আমরা কী দিই। আমরা ও-সবে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজেদের কাজ ম্যানেজ করে গেলাম, অর্থাৎ যতটা পারা যায়

রসগোল্লা, ঘোলের সরবৎ, ডাবের জল এসব সেঁটে নিলাম। এক-আধজন বেশ ব্যাজার হল, একজনের গলা তো স্পষ্টই শোনা গেল ঃ দুশো সাতাশ টাকা বাকি—গজগোবিন্দবাবু একটা পয়সা ছোঁয়ালেন না—আবার দুটো ছোকরা এসে তিনটাকার খাবার সাবড়ে গেল!

ও-সব তুচ্ছ কথায় আমরা কান দিলাম না—দেওয়ার দরকারই বোধ হল না। উপরন্তু দু-জনে চারটে করে পান নিয়ে নেমে এলাম রাস্তায়।

আমি টেনিদাকে বললাম, এ-সব ঘোল-ফোল খেয়ে পেট ভরিয়ে লাভ কী? তোমার সেই নাসিকামোহন নস্য কোম্পানিতেই চলো না!—বলতে বলতে আমার নোলায় প্রায় আধসের জল এসে গেল। পোলাওটা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাহলে খেতে জুত লাগবে না। তা ছাড়া বেশি দেরি হলে মাংসও আর থাকবে না—কেবল খানকয়েক পাঁটার হাড় পড়ে থাকবে।

টেনিদা বললে, আঃ—এই পেটুকটা দেখছি জ্বালিয়ে খেল! এইসব টুকটাক্ খেয়ে ক্ষিদেটা জমিয়ে নিচ্ছি, তা এটার কিছুতেই আর তর সইছে না!

—মানে, আমি বলেছিলাম, যদি ফুরিয়ে-টুরিয়ে যায়—

—হুঁ, সেও একটা কথা বটে!—টেনিদা নাক চুলকে বললে, আচ্ছা চল্—যাওয়া যাক—

ঠিকানা বাগবাজারের। তাও কি এক গলির মধ্যে! অনেক খুঁজে পেতে বের করতে হল।

এই নাকি নাসিকামোহন নস্য কোম্পানি! দেখে কেমন যেন খটকা লেগে গেল। একটা পুরোনো একতলা ঘর। ভেতরে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। বাইরে একটা সাইনবোর্ড—তাতে

প্রকাণ্ড নাকওলা একটা লোক এক জালা নস্যি টানছে, এমনি একটা ছবি! সাইনবোর্ডটা কেমন কাত হয়ে ঝুলছে। এরাই খাওয়াবে মাংস-পোলাও!

বললাম, টেনিদা—পোলাও-টোলাওরের গন্ধ তো পাচ্ছি না!

টেনিদা বললে, আছে—সব আছে। চল্—ভেতরে যাই।

ঘরে ঢুকে দেখি একটা ময়লা-চাদর-পাতা তক্তপোষে দুটো ষণ্ডা-মতন লোক কেলে হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে আছে। পাশে একটা কাচভাঙা আলমারি—তাতে গোটাকয়েক শিশি-বোতল। আর কিচ্ছু নেই।

আমরা কিরকম ঘাবড়ে গেলাম। জায়গা ভুল করিনি তো! কিন্তু তাই বা কী করে হবে! বাইরে তো স্পষ্টই সাইনবোর্ড ঝুলছে। ওই তো আলমারির গায়ে সাঁটা এক টুকরো কাগজে লেখা রয়েছে: নাসিকামোহন নস্য কোম্পানী—প্রোঃ চন্দ্রকান্ত চাকলাদার।

আমাদের দেখেই একটা লোক বাঘাটে গলায় বললে, কী চাই?

সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় দরজার বাইরে। টেনিদা ঢোক গিলে বললে, আমরা হালখাতার নেমন্তন্ন পেয়ে আসছি।

—হালখাতার নেমন্তন্ন!—লোকটা তেমনি বাঘা গলায় কি বলতে যাচ্ছিল, দু-নম্বর তাকে থামিয়ে দিলে। বললে, কে পাঠিয়েছে তোমাদের?

ব্যাপারটা কি রকম গোলমেলে মনে হল। আমি ভাবছিলাম কেটে পড়া উচিত, কিন্তু টেনিদা হাল ছাড়ল না। পকেট থেকে সেই চিঠিটা বের করে বললে, এই তো—মামা আমাদের পাঠিয়েছেন। মামা—মানে গজগোবিন্দ হালদার—

—গজগোবিন্দ হালদার ?—প্রথম লোকটা এবারে ঝাঁটা-গোঁফের পাশ দিয়ে মিটি-মিটি হাসলঃ ওহো—তাই বলো! আগে বললেই বুঝতে পারতাম। আমাদের এখানে আজ স্পেশ্যাল ব্যবস্থা কিনা—তাই বেছে বেছে মাত্র জনকয়েককে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। তা গজগোবিন্দবাবু কোথায়? তিনি যে বড় এলেন না ?

—তিনি একটু জরুরি কাজে আসানসোলে গেছেন—টেনিদা পটাং করে মিথ্যে কথা বলে দিলেঃ তাই আমাদের এখানে আসতে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

শুনে প্রথম লোকটা দ্বিতীয় লোকটার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপরে তেমনি হাসি-হাসি মুখে বললে, তা তোমরা এসেছ—তাতেও হবে। এসো-এসো—

লোকটা উঠে দাঁড়ালো।

—চল ভেতরের ঘরে। সেখানেই বিরিয়ানি পোলাও আর মোগলাই কালিয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা! এসো—চলে এসো—নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—

টেনিদা বললে, আয় প্যালা—

আসতে বলার দরকার ছিল না। তার অনেক আগেই এসে পড়েছি আমি। জিবের ডগায় সুড়সুড় করে উঠছে। সরবৎ-টরবৎগুলো এতক্ষণ পেটের মধ্যেই ছিল—হঠাৎ সেগুলো হজম হয়ে গিয়ে ক্ষিদেয় নাড়ি-ভুঁড়ি চুঁই-চুঁই করতে লাগল।

সেই লোকটার পেছনে পেছনে আমরা এগিয়ে চললাম। একটা অন্ধকার বারান্দা—তারপরে আর একটা ঘর। তার মধ্যেও আলো নেই। লোকটা বললে, ঢুকে পড়ো এখানে।

—অন্ধকার যে!—টেনিদার গলায় সন্দেহের সুর। আমার

কি রকম যেন বেয়াড়া লাগল। যে-ঘরে পোলাও কালিয়া থাকে সে ঘর অন্ধকার থাকবে কেন? পোলাওয়ের জলুসেই আলো হয়ে থাকবার কথা!

লোকটা বললে, ঢোকো না—আলো জ্বেলে দিচ্ছি।

টেনিদা ঢুকল, পেছন পেছন আমিও। আর যেই ঢুকেছি—অম্‌নি পটাৎ করে লোকটা দরজা বন্ধ করে দিলে।

—একি—একি—দোর বন্ধ করছেন কেন?

দরজার ওপার থেকে সেই লোকটার পৈশাচিক অট্টহাসি শোনা গেল: পোলাও-কালিয়া খাওয়াব বলে!

—শেকল আটকে দিলেন কেন?—আমি চেঁচিয়ে উঠলাম: ঘরে তো পোলাও-কালিয়া কিছু নেই! এ যে কয়লার ঘর মনে হচ্ছে! ঘুঁটের গন্ধ আসছে—

লোকটা আবার বাজখাঁই গলায় বললে, ঘুঁটের গন্ধ! শুধু ঘুঁটের গন্ধেই পার পেয়ে যাবে ভেবেছ? এরপরে তিনটি বাছা বাছা গুণ্ডা আসবে—দেবে রাম ঠ্যাঙানি—যাকে বলে আড়ং-ধোলাই! প্রাণ খুলে পোলাও-কালিয়া খাবে!

শুনে আমার হাত-পা সোজা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল! আমি ধপাস্ করে সেই অন্ধকার কয়লার ঘরের মেঝেই বসে পড়লাম। নাক মুখের ওপর দিয়ে ফুড়ুক ফুড়ুক করে গোটা-চারেক আরশোলা উড়ে গেল।

টেনিদা কাঁপতে কাঁপতে বললে, আমাদের সঙ্গে এ রসিকতা কেন স্যার? আমরা কী করেছি?

—কী করেছ?—লোকটা সিংহনাদ ছাড়ল: তোমরা—মানে, তোমার মামা গজগোবিন্দ আমাদের কোম্পানী থেকে তিনশো তিপ্পান্ন টাকার নস্যি কিনেছে তিন বছর ধরে—সব

বাকিতে। একটা পয়সা ছোঁয়ায়নি। তারপর আর এ-পাড়া সে মাড়ায়নি—আর আমাদের কোম্পানী তারই জন্যে লালবাতি জ্বেলেছে। আজ তাকে ঠ্যাঙাবার জন্যেই পোলাও-মাংসের টোপ ফেলেছিলাম। সে আসেনি—তোমরা এসেছ। টাকা তো পাবই না—কিন্তু তোমাদের রাম ঠ্যাঙানি দিয়ে যতটা পারি—সুখ করে নেব। একটু দাঁড়াও গুণ্ডারা এল বলে—

টেনিদা হাঁউ-মাউ করে উঠল: দোহাই স্যার—আমাদের ছেড়ে দিন স্যার! আমরা নেহাৎ নাবালক, নস্যি-টস্যির ধার ধারিনে—আমাদের ছেড়ে দিন—

কিন্তু লোকটার আর সাড়া পাওয়া গেল না। দরজায় শেকল দিয়ে বেমালুম সরে পড়েছে। গুণ্ডা ডাকতেই গেছে খুব সম্ভব।

আমার পালাজ্বরের পিলেতে গুর-গুর করে শব্দ হচ্ছে। বুকের ভেতর ঠাণ্ডা হিম। চোখের সামনে কেবল পটোল-ধুঁদুল-কাঁচকলা এইসব দেখতে পাচ্ছি। হালখাতার পোলাও খেতে গিয়ে পটলডাঙার প্যালারামের এবার পটোল তোলবার জো!

টেনিদা বললে, প্যালারে—মেরে ফেলবে যে!

আমার গলা দিয়ে কেবল কুঁই কুঁই করে খানিকটা আওয়াজ বেরুল।

—ওরে বাবা পায়ের ওপর দিয়ে যে ছুঁচো দৌড়োচ্ছে!

—এর পরে লাঠি দৌড়োবে—অনেক কষ্টে আমি বলতে পারলাম।

টেনিদা দরজাটার ওপর দুম্-দুম্ করে লাথি ছুড়তে লাগল: দোহাই স্যার—ছেড়ে দিন স্যার—আমরা নেহাৎ নাবালক স্যার—

কটাৎ! আমার কপালে কিসে যেন ঠোকর মারল! তার

পরেই কী একটা প্রাণী নাকের ওপর একটা নোংরা পাখার ঘা দিয়ে উড়ে গেল। নির্ঘাত চামচিকে!

—বাপ্‌রে—বলে আমি লাফ মারলাম। এক লাফে একটা জানলার কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কার করলাম, জানলার গরাদ ভাঙা। অর্থাৎ গলে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

টেনিদা তখনো প্রাণপণে দরজা ধাক্কাচ্ছে। চেঁচিয়ে বললাম, টেনিদা, এখানে একটা ভাঙা জানলা!

—কই? কোথায়?

—এই তো—বলেই আমি জানলা দিয়ে দু-নম্বর লাফ। আর সঙ্গে সঙ্গে—একেবারে ডাস্টবিনে রাজ্যের দুর্গন্ধ আবর্জনার ভেতরে।

টেনিদাও আমার ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ল পরমুহূর্তেই। আর তক্ষুনি উলটে গেল ডাস্টবিন। আমাদের গায়ে মাথায় পৃথিবীর সবরকম পচা আর নোংরা জিনিস একেবারে মাখামাখি! হালখাতার খাওয়া-দাওয়াই বটে! অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে যা কিছু খেয়েছিলাম—সব ঠেলে বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে।

কিন্তু বমি করারও সময় নেই আর। পেছনে একটা কুকুর তাড়া করেছে—কারা যেন বললে, চোর—চোর! সর্বাঙ্গে সেই পচা আবর্জনা মেখে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করেছি আমরা। সোজা বড় রাস্তার দিকে। সেখান থেকে একেবারে গিয়ে গঙ্গায় নামতে হবে—পুরো দু-ঘণ্টা চান না করলে গায়ের গন্ধ যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আমি সগর্বে ঘোষণা করলাম, জানিস, আমার ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে !

ক্যাবলা একটা গুলতি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটা নেড়ি কুকুরের ল্যাজকে তাক করছিল। কুকুরটা বেশ বসে ছিল, হঠাৎ কি মনে করে ঘেঁাক শব্দে পিঠের একটা এঁটুলিকে কামড়ে দিলে—তারপর পাঁই-পাঁই করে ছুট লাগালো। ক্যাবলা ব্যাজার হয়ে বললে, দ্যুৎ ! কতক্ষণ ধরে টার্গেট করছি—ব্যাটা পালিয়ে গেল !—আমার দিকে ফিরে বললে, তোর ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে—এ আর বেশি কথা কী ! আমার বড় কাকা, মেজ কাকা, রাঙা কাকা সবাই দাঁত বাঁধিয়েছে। আচ্ছা, কাকারা সকলে দাঁত বাঁধায় কেন বল তো ? এর মানে কী ?

হাবুল সেন বললে, হঃ ! এইটা বোজোস্ নাই ? কাকা-গো কামই হইল দাঁত খিঁচানি। অত দাঁত খিঁচালে দাঁত খারাপ হইবো না তো কী ?

টেনিদা বসে বসে একমনে একটা দেশলাইয়ের কাঠি চিবুচ্ছিল। টেনিদার ওই একটা অভ্যেস—কিছুতেই মুখ বন্ধ রাখতে পারে না। একটা কিছু-না-কিছু তার চিবোনো চাই-ই চাই। রসগোল্লা, কাটলেট, ডালমুট, পকৌড়ি, কাজু বাদাম—কোনোটায় অরুচি নেই। যখন কিছু জোটে না, তখন চুয়িং গাম থেকে শুকনো কাঠি—যা পায় তাই চিবোয়। একবার ট্রেনে যেতে মনের ভুলে পাশের ভদ্রলোকের লম্বা দাড়ির ডগাটা খানিক

চিবিয়ে দিয়েছিল—সে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড! ভদ্রলোক রেগে গিয়ে টেনিদাকে ছাগল-টাগল কী সব যেন বলেছিলেন।

হঠাৎ কাঠি চিবুনো বন্ধ করে টেনিদা বললে, দাঁতের কথা কী হচ্ছিল র‍্যা? কী বলছিলি দাঁত নিয়ে?

আমি বললাম, আমার ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে।

ক্যাবলা বললে, ঈস্—ভারি একটা খবর শোনাচ্ছেন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে! আমার বড় কাকা, মেজ কাকা, ফুলু মাসি—

টেনিদা বাধা দিয়ে বললে, থাম্ থাম্, বেশি ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করিসনি। দাঁত বাঁধানোর কী জানিস তোরা? হুঁঃ! জানে বটে আমার কুট্টিমামা গজগোবিন্দ হালদার! সায়েবরা তাকে আদর করে ডাকে মিস্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে। সে-ও দাঁত বাঁধিয়েছিল। কিন্তু সে দাঁত এখন আর তার মুখে নেই—আছে ডুয়ার্সের জঙ্গলে।

—পড়ে গেছে বুঝি?

—পড়েই গেছে বটে!—টেনিদা তার খাঁড়ার মতো নাক-টাকে খাড়া করে একটা হাসি হাসল—যাকে বাংলায় বলে হাই ক্লাস, তারপর বললে, সে-দাঁত কেড়ে নিয়ে গেছে।

—দাঁত কেড়ে নিয়েছে? সে আবার কী? আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, এত জিনিস থাকতে দাঁত কাড়তে যাবে কেন?

—কেন? টেনিদা আবার হাসল: দরকার থাকলেই কাড়ে। কে নিয়েছে বল্ দেখি?

ক্যাবলা অনেক ভেবে-চিন্তে বললে, যার দাঁত নেই।

—ইঃ, কী পণ্ডিত! টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, দিলে বলে! অত সোজা নয়, বুঝলি? আমার কুট্টিমামার দাঁত যে-সে নয়—সে এক-একটা মুলোর মতো। সে বাঘা দাঁতকে বাগানো যার-তার কাজ নয়।

—তবে বাগাইল কেডা ? বাঘে ? হাবুলের জিজ্ঞাসা।

—এঁঃ, বাঘে ! বলছি দাঁড়া। ক্যাবলা, তার আগে দু-আনার ডালমুট নিয়ে আয়—

হাঁড়ির মতো মুখ করে ক্যাবলা ডালমুট আনতে গেল। মানে, যেতেই হল তাকে।

আমাদের জুলজুলে চোখের সামনে একাই ডালমুটের ঠোঙা সাবাড় করে টেনিদা বললে, আমার কুট্টিমামার কথা মনে আছে তো ? সেই যে চা-বাগানে চাকরি করে আর একাই দশজনের মতো খেয়ে সাবাড় করে ? আরে, সেই লোকটা—যে ভালুকের নাক পুড়িয়ে দিয়েছিল ?

আমরা সমস্বরে বললাম, বিলক্ষণ ! 'কুট্টিমামার হাতের কাজ' কি এত সহজেই ভোলবার ?

টেনিদা বললে, সেই কুট্টিমামারই গল্প। জানিস তো—সায়েবরা ডেকে নিয়ে মামাকে চা-বাগানে চাকরি দিয়েছিল ? মামা খাসা আছে সেখানে। খায়-দায় কাঁসি বাজায়। কিন্তু বেশি সুখ কি আর কপালে সয় রে ? একদিন জুত করে একটা বন-মুরগির রোস্টে যেই কামড় বসিয়েছে—অমনি ঝন্-ঝনাৎ ! কুট্টিমামার একটা দাঁত পড়ল প্লেটের ওপর খসে, আর তিনটে গেল নড়ে।

হয়েছিল কী, জানিস ? শিকার করে আনা হয়েছিল তো বন-মুরগি ? মাংসের মধ্যে ছিল গোটাকয়েক ছর্‌রা। বেকায়দা কামড় পড়তেই অ্যাকসিডেন্ট, দাঁতের বারোটা বেজে গেল।

মাংস রইল মাথায়—ঝাড়া তিন ঘণ্টা নাচানাচি করলে কুট্টি-মামা। কখনো কেঁদে বললে, পিসিমা গো তুমি কোথায় গেলে ? কখনো ককিয়ে ককিয়ে বললে, ইঁ-হি-হি—আমি গেলুম ! আবার

কখনো দাপিয়ে দাপিয়ে বললে, ওরে বন-মুরগি রে—তোর মনে এই ছিল রে! শেষকালে তুই আমায় এমন করে পথে বসিয়ে গেলি রে!

পাক্কা তিন দিন কুট্টিমামা কিচ্ছুটি চিবতে পারল না। শুধু রোজ সের-পাঁচেক করে খাঁটি দুধ আর ডজন-চারেক কমলা লেবুর রস খেয়ে কোনোমতে পিত্তিরক্ষা করতে লাগল।

দাঁতের ব্যথা-ট্যথা একটু কমলে সায়েবরা কুট্টিমামাকে বললে, তোমাকে ডেনটিস্টের ওখানে যেতে হবে!

—অ্যাঁ!

সায়েবরা বললে, দাঁত বাঁধিয়ে আসতে হবে।

ডেনটিস্টের নাম শুনেই তো কুট্টিমামার চোখে তালগাছে চড়ে গেল। কুট্টিমামার দাদু নাকি একবার দাঁত তুলতে গিয়েছিলেন। যে ডাক্তার দাঁত তুলছিলেন, তিনি চোখে কম দেখতেন। ডাক্তার করলেন কী—দাঁত ভেবে কুট্টিমামার দাদুর নাকে সাঁড়াশি আটকে দিয়ে সেটাকেই টানতে লাগলেন! আর বলতে লাগলেন ঃ ইস্—কী প্রকাণ্ড গজদন্ত, আর কী ভীষণ শক্ত! কিছুতেই নাড়াতে পারছি না!

কুট্টিমামার দাদু তো হাঁই-মাই করে বলতে লাগলেন, ওঁটা —ওঁটা আঁমার আঁক! অঁাক!—টানের চোটে নাক বেরুচ্ছিল না—অঁাক।

ডাক্তার রেগে বললেন, আর হাঁক-ডাক করতে হবে না—খুব হয়েছে! আরো গোটা-কয়েক টান-ফান দিয়ে নাকটাকে যখন কিছুতেই কায়দা করতে পারলেন না—তখন বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ নাঃ, হল না! এমন বিচ্ছিরি শক্ত দাঁত আমি কখনো দেখিনি! এরকম দাঁত কোনো ভদ্রলোকে তুলতে পারে না।

কুট্টিমামার দাদু বাড়ি ফিরে এসে বারো দিন নাকের ব্যথায় বিছানায় শুয়ে রইলেন। তেরো দিনের দিন উকিল ডাকিয়ে উইল করলেনঃ 'আমার পুত্র বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে-কেহ দাঁত বাঁধাইতে যাইবে, তাহাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি হইতে চিরতরে বঞ্চিত করিব।'

অবিশ্যি কুট্টিমামার দাদুর সম্পত্তিতে কুট্টিমামার কোনো রাইট নেই—তবু দাদুর আদেশ তো! কুট্টিমামা গাঁই-গুই করতে লাগলেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে 'মাই নোজ'-টোজও বলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সায়েবের গোঁ—জানিস তো? ঝড়াং করে বলে দিলে, নো ফোক্‌লা দাঁত উইল ডু! দাঁত বাঁধাতেই হবে!

কুট্টিমামা তো মনে মনে 'তনয়ে তারো তারিণী' বলে রাম-প্রসাদী গান গাইতে গাইতে, বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে ডেনটিস্টের কাছে হাজির। ডেনটিস্ট প্রথমেই তাঁকে একটা চেয়ারে বসালে। তারপর দাঁতের ওপরে খুর খুর করে একটা ইলেকট্রিক বুরুশ বসিয়ে সেগুলোকে অর্ধেক ক্ষয় করে দিলে। একটা ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে বাকি সবকটা দাঁতকে নড়িয়ে ফেললে। শেষে বেজায় খুশি হয়ে বললে, এর দু-পাটি দাঁতই খারাপ। সব তুলে ফেলতে হবে।

শুনেই কুট্টিমামা প্রায় অজ্ঞান! গোটা-তিনেক খাবি খেয়ে বললেন, নাকটাও?

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন, চোপরাও!

তারপর আর কী? একটা পেল্লায় সাঁড়াশি নিয়ে ডাক্তার কুরুৎ কুরুৎ করে কুট্টিমামার সব কটা দাঁত তুলে দিলে। কুট্টিমামা আয়নায় নিজের মূর্তি দেখে কেঁদে ফেললেন। কিচ্ছুটি

নেই মুখের ভেতর—একদম গাঁয়ের পেছল রাস্তার মতো—মাঝে মাঝে গর্ত। ওঁকে ঠিক বাড়ির বুড়ি ধাই রামধনিয়ার মত দেখাচ্ছিল।

কুট্টিমামা কেঁদে ফ্যাক ফ্যাক করে বললেন, ওগো আমার কী হল গো—

ডাক্তার আবার ধমক দিয়ে বললে, চোপরাও! সাত দিন পরে এসো—বাঁধানো দাঁত পাবে।

বাঁধানো দাঁত নিয়ে কুট্টিমামা ফিরলেন। দেখতে শুনতে দাঁতগুলো নেহাত খারাপ নয়। খাওয়াও যায় একরকম। খালি একটা অসুবিধে হত। খাওয়ার অর্ধেক জিনিস জমে থাকত দাঁতের গোড়ায়। পরে আবার সেগুলোকে জাবর কাটতে হত।

তবু ওই দাঁত নিয়েই দুঃখে সুখে কুট্টিমামার দিন কাটছিল। কিন্তু সাহেবের কাণ্ড জানিস তো? ওদের সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—কিছুতেই তিনটে দিন বসে থাকতে পারে না। একদিন বললে, মিস্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে, আমরা বাঘ শিকার করতে যাব। তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

বাঘ-টাঘের ব্যাপার কুট্টিমামার তেমন পছন্দ হয় না। কারণ বাঘ হরিণ নয়—তাকে খাওয়া যায় না, বরং সেই উলটে খেতে আসে। কুট্টিমামা খেতে ভালোবাসে, কিন্তু কুট্টি-মামাকেই কেউ খেতে ভালোবাসে—এ-কথা ভাবলে তাঁর মন ব্যাজার হয়ে যায়। বাঘগুলো যেন কী! গায়ে যেমন বিটকেল গন্ধ, স্বভাব চরিত্তিরও তেমনি যাচ্ছেতাই!

কুট্টিমামা কান চুলকে বললে, বাঘ স্যার—ভেরি ব্যাড স্যার—আই নট্ লাইক্ স্যার—

কিন্তু সায়েবরা সে কথা শুনলে তো! গোঁ যখন ধরেছে

তখন গেলই। আর কুট্‌টিমামাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলে গেল।

গিয়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলে এক ফরেস্ট বাংলোয় উঠল।

চারদিকে ধুন্ধুমার বন। দেখলেই পিত্তি ঠাণ্ডা হয়ে আসে। রাত্তিরে হাতির ডাক শোনা যায়—বাঘ হুম্‌-হাম্‌ করতে থাকে। গাছের ওপর থেকে টুপ-টুপ করে জোঁক পড়ে গায়ে। বানর এসে খামোকা ভেংচি কাটে। সকালে কুট্‌টিমামা দাড়ি কামাচ্ছিলেন—একটা বানর এসে 'ইলিক্‌ চিলিক্‌' এইসব বলে তাঁর বুরুশটা নিয়ে গেল। আর সে কী মশা! দিন নেই—রাত্তির নেই—সমানে কামড়াচ্ছে। কামড়ানোও যাকে বলে! দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই হাতে পায়ে মুখে যেন চাষ করে ফেললে।

তার মধ্যে আবার সায়েবগুলো মোটর গাড়ি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকল বাঘ মারতে।

—মিস্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে, তুমিও চলো।

কুট্‌টিমামা তক্ষুনি বিছানায় শুয়ে হাত পা ছুড়তে আরম্ভ করে দিলে। চোখদুটোকে আলুর মতো বড় বড় করে, মুখে গ্যাঁজলা তুলে বলতে লাগল: বেলি পেইন স্যার—পেটে ব্যথা স্যার—অবস্থা সিরিয়াস্‌ স্যার—

দেখে সায়েবরা ঘোঁয়া-ঘোঁয়া—ঘ্যঁায়োৎ-ঘ্যঁায়োৎ করে বেশ খানিকটা হাসল।—ইউ গাঁজা-গাবিণ্ডে, ভেরি নটি—বলে একজন কুট্‌টিমামার পেটে একটা চিমটি কাটলে—তারপর বন্দুক কাঁধে ফেলে শিকারে চলে গেল।

আর যেই সায়েবরা চলে যাওয়া—অমনি তড়াক করে উঠে বসলেন কুট্‌টিমামা। তক্ষুনি এক ডজন কলা, দুটো পাঁউরুটি

আর এক শিশি পেয়ারার জেলি খেয়ে শরীর টরীর ভালো করে ফেললেন।

বাংলোর পাশেই একটা ছোট পাহাড়ি ঝর্ণা। সেখানে একটা শিমুল গাছ। কুট্টিমামা একখানা পেল্লায় কালীসিঙ্গির মহাভারত নিয়ে সেখানে এসে বসলেন।

চারদিকে পাখি-টাখি ডাকছিল। পেটটা ভরা ছিল, মিঠে মিঠে হাওয়া দিচ্ছিল—কুট্টিমামা খুশি হয়ে মহাভারতের সেই জায়গাটা পড়তে আরম্ভ করলেন—যেখানে ভীম বকরাক্ষসের খাবার-দাবারগুলো সব খেয়ে নিচ্ছে।

পড়তে পড়তে ভাবের আবেগে কুট্টিমামার চোখে জল এসেছে, এমন সময় ঃ গর্ র্—গর্ র্—

কুট্টিমামা চোখ তুলে তাকাতেই ঃ

কী সর্বনাশ! ঝর্ণার ওপারে বাঘ!

কী রূপ বাছার! দেখলেই পিলে-টিলে উল্টে যায়। হাঁড়ির মতো প্রকাণ্ড মাথা, আগুনের ভাঁটার মতো চোখ, হল্দের ওপরে কালো কালো ডোরা, অজগরের মতো বিশাল ল্যাজ। মস্ত হাঁ করে, মুলোর মতো দাঁত বের করে আবার বললে, গর্—র্—র্!

একেই বলে বরাত! যে-বাঘের ভয়ে কুট্টিমামা শিকারে গেলেন না, সে-বাঘ নিজে থেকেই দোরগোড়ায় হাজির। আর কেউ বলে তক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যেত, আর বাঘ তাকে সারিডন ট্যাবেলেটের মতো টপাং করে গিলে ফেলত। কিন্তু আমারই মামা তো—ভাঙেন তবু মচকান না। তক্ষুনি মহাভারত বগলদাবা করে এক লাফে একেবারে শিমুল গাছের মগডালে।

বাঘ এসে গাছের নিচে থাবা পেতে বসল। দু-চারবার থাবা দিয়ে গাছের গুঁড়ি আঁচড়ায়, আর ওপর দিকে তাকিয়ে

ডাকেঃ ঘঁর্—র, ঘুঁ—ঘুঁ! বোধহয় বলতে চায়—তুমি তো দেখছি পয়লা নম্বরের ঘুঘু!

কিন্তু বাঘটা তখনো ঘুঘুই দেখেছে—ফাঁদ দেখেনি। দেখল একটু পরেই। কিছুক্ষণ পরে বাঘটা রেগে যেই ঘ্যাঁক করে একটা হাঁক দিয়েছে—অমনি দারুণ চম্‌কে উঠেছেন কুট্‌টিমামা, আর বগল থেকে কালীসিঙ্গির সেই জগঝম্প মহাভারত ধপাস্ করে নিচে পড়েছে। আর পড়বি তো পড় সোজা বাঘের মুখে। সেই মহাভারতের ওজন কম্‌সে কম পাক্কা বারো সের—তার ঘায়ে মানুষ খুন হয়—বাঘও তার ঘা খেয়ে উল্‌টে পড়ে গেল। তারপর গোঁ—গোঁ—ঘেয়াং—ঘেয়াং বলে বার-কয়েক ডেকেই—এক লাফে ঝর্ণা পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাওয়া।

কুট্‌টিমামা আরো আধ ঘণ্টা গাছের ডালে বসে ঠক-ঠক করে কাঁপলেন। তারপর নিচে নেমে দেখলেন মহাভারত ঠিক তেমনি পড়ে আছে—তার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। আর তার চারপাশে ছড়ানো আছে কেবল দাঁত—বাঘের দাঁত। একেবারে গোনা-গুন্‌তি বত্রিশটা দাঁত—মহাভারতের ঘায়ে একটি দাঁতও আর বাঘের থাকেনি। দাঁতগুলো কুড়িয়ে নিয়ে, মহাভারতকে মাথায় ঠেকিয়ে, কুট্‌টিমামা এক দৌড়ে বাংলোতে। তারপর সায়েবরা ফিরে আসতেই কুট্‌টিমামা সেগুলো তাদের দেখিয়ে বললে, টাইগার টুথ!

ব্যাপার দেখে সায়েবরা তো থ!

তাই তো—বাঘের দাঁতই তো বটে! পেলে কোথায়?

কুট্‌টিমামা ডাঁট দেখিয়ে বুক চিতিয়ে বললে, আই গো টু ঝর্ণা। টাইগার কাম্। আই ডু বক্‌সিং—মানে ঘুসি মারলাম। অল্ টুথ ব্রেক। টাইগার কাট ডাউন মানে বাঘ কেটে পড়ল।

সায়েবরা বিশ্বাস করল কি না কে জানে, কিন্তু কুট্টিমামার ভীষণ খাতির বেড়ে গেল। রিয়্যালি, গাঁজা-গাবিণ্ডে ইজ এ হিরো! দেখতে কাঁকলাসের মতো হলে কী হয়—হি ইজ এ গ্রেট হিরো! সেদিন খাওয়ার টেবিলে একখানা আস্ত হরিণের ঠ্যাং মেরে দিলেন কুট্টিমামা।

পরদিন আবার সায়েবরা শিকারে যাওয়ার সময় ওঁকে ধরে টানাটানি: আজ তোমাকে যেতেই হবে আমাদের সঙ্গে। ইউ আর এ বিগ পালোয়ান!

মহা ফ্যাসাদ! শেষকালে কুট্টিমামা অনেক করে বোঝালেন, বাঘের সঙ্গে বক্‌সিং করে ওঁর গায়ে খুব ব্যথা হয়েছে। আজকের দিনটাও থাক।

সায়েবরা শুনে ভেবেচিন্তে বললে, অল্ রাইট—অল্ রাইট।

আজকে কুট্টিমামা হুঁসিয়ার হয়ে গেছেন—বাংলোর বাইরে আর বেরুলেনই না। বাংলোর বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে আবার সেই কালীসিঙ্গির মহাভারত নিয়ে বসলেন।

—ঘেঁয়াও—ঘুঙ্—

কুট্টিমামা আঁতকে উঠলেন। বাংলোর সামনে তারের বেড়া—তার ওপারে সেই বাঘ। কেমন যেন জোড়হাত করে বসেছে। কুট্টিমামার মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে বললে, ঘেঁয়াং—কুঁই!

আর হাঁ করে মুখটা দেখালো।

ঠিক সেইরকম। দাঁতগুলো তোলবার পরে কুট্টিমামার মুখের যে চেহারা হয়েছিল, অবিকল তা-ই। একেবারে পরিষ্কার—একটা দাঁত নেই। নির্ঘাৎ রামধনিয়ার মুখ!

বাঘটা হুবহু কান্নার সুরে বললে, ঘ্যাং—ঘ্যাং—ভ্যাঁও!

ভাবটা এই ঃ দাঁতগুলো তো সব গেল দাদা! আমার খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ। এখন কী করি?

কিন্তু তার আগেই এক লাফে কুট্‌টিমামা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছেন। বাঘটা আরো কিছুক্ষণ ঘঁ্যাং-ঘঁ্যাং—ভঁ্যাও ভঁ্যাও করে কেঁদে বনের মধ্যে চলে গেল।

পরদিন সকালে কুট্‌টিমামা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বাঁধানো দাঁতের পাটিদুটো খুলে নিয়ে বেশ করে মাজছিলেন। দিব্যি সকালের রোদ উঠেছে—সায়েবগুলো ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমুচ্ছে তখনো, আর কুট্‌টিমামা দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ফ্যাক-ফ্যাকে গলায় গান গাইছিলেন ঃ 'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সে-ও ভালো—'

সকালবেলায় চাঁদের আলোয় গান গাইতে গাইতে কুট্‌টি-মামার বোধহয় আর কোনদিকে খেয়ালই ছিল না। ওদিকে সেই ফোকলা বাঘ এসে জানলার বাইরে বসে রয়েছে ঝোপের ভেতরে। কুট্‌টিমামার দাঁত খোলা—বুরুশ দিয়ে মাজা—সব দেখেছে এক মনে। মাজা-টাজা শেষ করে যেই কুট্‌টিমামা দাঁত দু-পাটি মুখে পুরতে যাবেন—অমনি ঃ ঘোঁয়াৎ, ঘালুম!

অর্থাৎ, তোফা—এই তো পেলুম!

জানলা দিয়ে এক লাফে বাঘ ঘরের মধ্যে।

—টা—টাইগার—পর্যন্ত বলেই কুট্‌টিমামা ফ্ল্যাট।

বাঘ কিন্তু কিছুই করলে না। টপাৎ করে কুট্‌টিমামার দাঁত দু-পাটি নিজের মুখে পুরে নিলে—কুট্‌টিমামা তখনও অজ্ঞান হননি—জুলজুল করে দেখতে লাগলেন, সেই দাঁত বাঘের মুখে বেশ ফিট করেছে। দাঁত পরে বাঘ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বাঘা হাসি হাসল, তারপর টপ্

করে টেবিল থেকে টুথব্রাশ আর টুথপেস্টের টিউব মুখে তুলে নিয়ে জানলা গলিয়ে আবার—

কুট্‌টিমামার ভাষায়—একেবারে উইণ্ড! মানে, হাওয়া হয়ে গেল।

টেনিদা থামল। আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্বিতভাবে বললে, তাই বলছিলুম, দাঁত বাঁধানোর গল্প আমার কাছে করিস নি! হুঁ!

চামচিকে আর টিকিট চেকার

—বুঝলি প্যালা, চামচিকে ভীষণ ডেঞ্জারাস!···একটা ফুটো শালপাতায় করে পটলডাঙার টেনিদা ঘুগনি খাচ্ছিল। শালপাতার তলা দিয়ে হাতে খানিক ঘুগনির রস পড়েছিল, চট্ করে সেটা চেটে নিয়ে পাতাটা তালগোল পাকিয়ে ছুড়ে দিলে ক্যাবলার নাকের ওপর। তারপর আবার বললে, হুঁ-হুঁ; ভীষণ ডেঞ্জারাস চামচিকে!

—কী কইর‍্যা বোঝলা—কও দেখি?—বিশুদ্ধ ঢাকাই ভাষায় জানতে চাইল হাবুল সেন।

—আচ্ছা, বল্ চামচিকের ইংরেজি কী?

আমি, ক্যাবলা আর হাবুল সেন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

—বল্ না!

শেষকালে ভেবে-চিন্তে ক্যাবলা বললে, স্মল ব্যাট। মানে ছোট বাদুড়।

—তোর মুণ্ডু!

আমি বললাম, তবে ব্যাট্‌লেট্। তাও নয়? তাহলে ব্যাট্‌স্ সান? মানে, বাদুড়ের ছেলে? হল না? আচ্ছা, ব্রিক-ব্যাট্ কাকে বলে?

টেনিদা বললে, থাম্ উল্লুক! ব্রিক-ব্যাট হল থান ইট! এবার তা-ই একটা তোর মাথায় ভাঙব!

হাবুল সেন গম্ভীর মুখে বললে, হইছে!

—কী হল?

—স্কিন মোল।

—স্কিন মোল!···টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটাকে মনুমেণ্টের মতো উঁচু করে ধরল: সে আবার কী?

—স্কিন মানে হইল চাম—অর্থাৎ কিনা চামড়া। আমাগো দ্যাশে ছুঁচারে কয় চিকা—মোল। দুইটা মিলাইয়া স্কিন মোল।

টেনিদা ক্ষেপে গেল: দ্যাখ হাবুল, ইয়ার্কির একটা মাত্রা আছে, বুঝলি? স্কিন মোল! ইঃ—গবেষণার দৌড়টা দেখ একবার!

আমি বললাম, চামচিকের ইংরেজি কী তা নিয়ে আমাদের জ্বালাচ্ছ কেন? ডিক্সনারি দ্যাখো গে।

—ডিক্সনারিতেও নেই।—টেনিদা জয়ের হাসি হাসল।

—তাহলে?

—তাহলে এইটাই প্রমাণ হল, চামচিকে কী ভীষণ জিনিস! অর্থাৎ এমন ভয়ানক, যে চামচিকেকে সাহেবরাও ভয় পায়! মনে কর্ না—যারা আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে সিংহ আর গরিলা মারে, যারা যুদ্ধে গিয়ে দমাদম বোমা আর কামান ছোড়ে, তারা-শুদ্ধ চামচিকের নাম করতে ভয় পায়। আমি নিজের চোখেই সেই ভীষণ ব্যাপারটা দেখেছি।

—কী ভীষণ ব্যাপার?—গল্পের গন্ধে আমরা তিনজনে টেনিদাকে চেপে ধরলাম: বলো এক্ষুনি!

—ক্যাবলা, তাহলে চটপট যা। গলির মোড় থেকে আরো দু-আনার পাঁটার ঘুগনি নিয়ে আয়। রসদ না হলে গল্প জমবে না।

ব্যাজার মুখে ক্যাবলা ঘুগনি আনতে গেল।

দু-আনার ঘুগনি একাই সবটা চেটে-পুটে খেয়ে, মানে আমাদের একফোঁটাও ভাগ না দিয়ে, টেনিদা শুরু করলে: তবে শোন্—

সেবার পাটনায় গেছি ছোটমামার ওখানে বেড়াতে। ছোট-মামা রেলে চাকরি করে—আসার সময় আমাকে বিনা টিকিটেই তুলে দিলে দিল্লী এক্সপ্রেসে। বললেঃ গাড়িতে চ্যাটার্জি যাচ্ছে ইন্‌চার্জ—আমার বন্ধু। কোন ভাবনা নেই—সেই-ই তোকে হাওড়া স্টেশনের গেট পর্যন্ত পার করে দেবে।

নিশ্চিন্ত মনে আমি একটা ফাঁকা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় চড়ে লম্বা হয়ে পড়লাম।

শীতের রাত। তার ওপর পশ্চিমের ঠাণ্ডা—হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরায়।

কিন্তু কে জানত—সেদিন হঠাৎ মাঝপথেই চ্যাটার্জির ডিউটি বদলে যাবে! আর তার জায়গায় আসবে—কী নাম ওর—মিস্টার রাইনোসেরাস!

ক্যাবলা বললে, রাইনোসেরাস মানে গণ্ডার।

—থাম্, বেশি বিদ্যে ফলাসনি!···টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, যেন ডিক্সনারি একেবারে! সায়েবের বাপ-মা যদি ছেলের নাম গণ্ডার রাখে—তাতে তোর কী র‍্যা? তোর নাম যে কিশলয়কুমার না হয়ে ক্যাবলা হয়েছে, তাতে কার কী ক্ষেতি হয়েছে শুনি?

হাবুল সেন বললে, ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও। পোলাপান!

—হুঁঃ, পোলাপান! আবার যদি বকবক করে তো জলপান করে ছাড়ব! যাক—শোন্। আমি তো বেশ করে গাড়ির দরজা এঁটে শুয়ে পড়েছি। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। একে দু-খানা কম্বলে শীত কাটছে না, তার ওপরে আবার খাওয়াটাও হয়ে গেছে বড্ড বেশি। মামাবাড়ির কালিয়ার পাঁটাটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠে গাড়ির তালে তালে পেটের ভেতরে শিং দিয়ে ঢুঁ মারছে! লোভে পড়ে অতটা না খেয়ে ফেললেই চলত।

পেট গরম হয়ে গেলেই লোকে নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখে—জানিস তো ? আমিও স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, আমার পেটের ভেতরে সেই যে বাতাপী না ইল্বল কে একটা ছিল—সেইটে পাঁটা হয়ে ঢুকেছে। একটা রাক্ষস এসে হিন্দি করে বলছে : এ ইল্বল—আভি ইস্‌কো পেট ফাটাকে জল্‌দি নিকাল আও—

—বাপরে—বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। চোখ চেয়ে দেখি গাড়ির ভেতরে বাতাপী ইল্বল কেউ নেই—শুধু ফর্‌-ফর্‌ করে একটা চামচিকে উড়ছে। একবার বোঁ করে আমার মুখের সামনে দিয়েই উড়ে গেল—নাকটাই খিম্‌চে ধরে আর কি !

এ তো আচ্ছা উৎপাত !

কোন্‌ দিক দিয়ে এল কে জানে ? চারদিকে তো দরজা-জানলা সবই বন্ধ। তবে, চামচিকের পক্ষে সবই সম্ভব। মানে অসাধ্য কিছু নেই।

একবার ভাবলাম, উঠে ওটাকে তাড়াই। কিন্তু যা শীত—কম্বল ছেড়ে নড়ে কার সাধ্যি ! তা ছাড়া উঠতে গেলে পেট ফুঁড়ে শিং টিং শুদ্ধ পাঁঠাটাই বেরিয়ে আসবে হয়ত বা। তারপর আবার যখন শাঁ করে নাকের কাছে এল, তখন বসে পড়ে আর কি ! আমার খাড়া নাকটা দেখে মনুমেণ্টের ডগাই ভাবল বোধ-হয়।

আমি বিচ্ছিরি মুখ করে বললাম, ফর্‌-র্‌ ! ফুস্‌ !—মানে চাম-চিকেটিকে ভয় দেখালাম। তাইতেই আঁৎকে গেল কি না কে জানে—শাঁ করে গিয়ে ঝুলে রইল একটা কোট-হ্যাঙ্গারের সঙ্গে। ঠিক মনে হল ছোট একটা কালো পুঁটলি ঝুলছে।

ঠিক অমনি সময় ঘটাঘট শব্দে কামরার দরজা নড়ে উঠল।

এত রাত্তিরে কে আবার জ্বালাতে এল ? নিশ্চয় কোন

প্যাসেঞ্জার! প্রথমটায় ভাবলাম, পড়ে থাকি ঘাপ্‌টি মেরে। যতক্ষণ খুশি ঘট্‌ঘটিয়ে কেটে পড়ুক লোকটা। আমি কম্বলের ভেতর মুখ ঢোকালাম।

কিন্তু কী একটা যাচ্ছেতাই স্টেশনে যে গাড়ি থেমেছে কে জানে! সেই যে দাঁড়িয়ে আছে—একদম নট নড়ন-চড়ন! যেন নেমন্তন্ন খেতে বসেছে! এদিকে দরজায় ঘট্‌ঘটানি সমানে চলতে লাগল। ভেঙে ফেলে আর কি!

এমন বেআক্কেলে লোক তো কখনো দেখিনি! ট্রেনে কি আর কামরা নেই যে এখানে এসে মাথা খুঁড়ে মরছে! ভারি রাগ হল। দরজা না খুলেও উপায় নেই—রিজার্ভ গাড়ি তো নয় আর! খুব কড়া গলায় হিন্দীতে একটা গালাগাল দেব মনে করে উঠে পড়লাম।

ক্যাবলা হঠাৎ বাধা দিয়ে বললে, তুমি মোটেই হিন্দী জানো না টেনিদা।

—মানে?

—তুমি যা বলো তা একেবারেই হিন্দী হয় না। আমি ছেলেবেলা থেকে পশ্চিমে ছিলাম—

—চুপ কর্ বলছি ক্যাব্‌লা!—টেনিদা হুঙ্কার ছাড়ল: ফের যদি ভুল ধরতে এসেছিস তো এক চাঁটিতে তোকে চাপাটি বানিয়ে ফেলব! আমার হিন্দী শুনে বাড়ির ঠাকুর পর্যন্ত ছাপ্‌রায় পালিয়ে গেল তা জানিস?

হাবুল বললে, ছাইড়া দাও—চ্যাংড়ার কথা কি ধরতে আছে?

—চ্যাংড়া? চিংড়ি মাছের মতো ভেজে খেয়ে ফেলব!

আমি বললাম, ওটা অখাদ্য জীব—খেলেপেট কামড়াবে, হজম করতে পারবে না। তার চেয়ে গল্পটা বলে যাও।

—হুঁ, শোন্!—টেনিদা ক্যাবলার ছ্যাবলামি দমন করে আবার বলে চলল ঃ

উঠে দরজা খুলে যেই বলতে গেছি ঃ এই, আপ কেইসা আদমি হ্যায়—সঙ্গে সঙ্গে গাঁক্-গাঁক্ করে আওয়াজ।

—গাঁক্-গাঁক্ ?

—মানে, সাহেব! মানে, টিকিট-চেকার!

—সেই রাইনোসেরাস ?—বকুনি খেয়েও ক্যাবলা সামলাতে পারল না।

—আবার কে? একদম খাঁটি সাহেব—পা থেকে মাথা ইস্তক। সেই যে একরকম সাহেব আছে না? গায়ের রঙ মোষের মতো কালো, ঘামলে গা দিয়ে কালি বেরোয়—যাদের দেখলে সায়েবের ওপরে ঘেন্না ধরে যায়—মোটেই সে রকমটি নয়। চুনকাম করা ফর্সা রঙ—হাঁড়ির মতো মুখ, মোটা নাকের ছ্যাঁদায় বড় বড় লালচে লোম—হাসলে মুখ-ভর্তি মুলো দেখা যায়, আর গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয় ষাঁড় ডাকছে—একেবারে সেই জিনিসটি!

ঢুকেই চোস্ত ইংরেজিতে আমাকে বললে, এই সন্ধেবেলাতেই এমন করে ঘুমুচ্ছ কেন? এইটেই সবচেয়ে বিচ্ছিরি হ্যাবিট!

—কী রকম চোস্ত ইংরেজি টেনিদা?—আমি জানতে চাইলাম।

—সে সব শুনে কী করবি?···টেনিদা উঁচুদরের হাসি হাসল ঃ শুনেও কিছু বুঝতে পারবি না—সায়েবের ইংরেজি কিনা! সে যাক। সায়েবের কথা শুনে আমার তো চোখ কপালে উঠল। রাত বারোটাকে বলছে সন্ধেবেলা! তাহলে ওদের রাত্তির হয় কখন? সকালে নাকি?

তারপরেই সায়েব বললে, তোমার টিকিট কই ?

আমার তো তৈরি জবাব ছিলই। বললাম, আমি পাটনার বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের ভাগনে। আমার কথা ক্রু-ইন-চার্জ চাটুজ্জেকে বলা আছে।

তাই শুনে সায়েবটা এমনি দাঁত খিচোলো যে, মনে হল মুলোর দোকান খুলে বসেছে। নাকের লোমের ভেতরে যেন ঝড় উঠল, আর বেরিয়ে এল খানিকটা গর্‌গরে আওয়াজ।

যা বললে, শুনে তো আমার চোখ চড়কগাছ !

—তোমার বাঁড়ুজ্জেমামাকে আমি থোড়াই পরোয়া করি ! এসব ডাব্‌লুটিরা ওরকম ঢের মামা পাতায় ! তা ছাড়া চাটুজ্জের ডিউটি বদল হয়ে গেছে—আমিই এই ট্রেনের ক্রু-ইনচার্জ। অতএব চালাকি রেখে পাটনা টু হাওড়া সেকেণ্ড ক্লাস ফেয়ার, আর বাড়তি জরিমানা বের করো !

পকেটে সবশুদ্ধ পাঁচটা টাকা আছে—সেকেণ্ড ক্লাস দূরে থাক, থার্ড ক্লাসের ভাড়াও হয় না। সর্ষের ফুল এর আগে দেখিনি—এবার দেখতে পেলাম। আর আমার গা দিয়ে সেই শীতেও দরদর করে সর্ষের তেল পড়তে লাগল।

আমি বলতে গেলাম, দ্যাখো সাহেব—

—সায়েব সায়েব বোলো না। আমার নাম মিস্টার রাইনো-সেরাস। আমার গণ্ডারের মতো গোঁ ! ভাড়া যদি না দাও—হাওড়ায় নেমে তোমায় পুলিশে দেব। ততক্ষণ আমি গাড়িতে চাবিবন্ধ করে রেখে যাচ্ছি।

কি বলব জানিস প্যালা—আমি পটলডাঙার টেনিরাম—অমন ঢের সায়েব দেখেছি। ইচ্ছে করলেই সায়েবকে ধরে চলতি গাড়ির জানলা দিয়ে ফেলে দিতে পারতাম। কিন্তু আমরা বোষ্টম—

জীবহিংসা করতে নেই, তাই অনেক কষ্টে রাগটা সামলে নিলাম।

হাবুল সেন বলে বসল ঃ জীবহিংসা কর না, তবে পাঠা খাও ক্যান ?

—আরো পাঁটার কথা আলাদা। ওরা হল অবোলা জীব, বামুনের পেটে গেলে স্বর্গে যায়। পাঁটা খাওয়া মানেই জীবে দয়া করা। সে যাক। কিন্তু সাহেবকে নিয়ে এখন আমি করি কী! এ তো আচ্ছা প্যাঁচ করে বসেছে! শেষকালে সত্যিই জেলে যেতে না হয়!

কিন্তু ভগবান ভরসা!

পকেট থেকে একটা ছোট খাতা বের করে সায়েব কী যেন লিখতে যাচ্ছিল পেনসিল দিয়ে,হঠাৎ সেই শব্দ—ফর্—ফর্ ফরাৎ!

চামচিকেটা আবার উড়তে শুরু করেছে। আমার মতোই তো বিনা টিকিটের যাত্রী—চেকার দেখে ভয় পেয়েছে নিশ্চয়। আর সঙ্গে-সঙ্গেই সায়েব ভয়ানক চমকে উঠল। বললে, কী পাখি ?

জবাব দিতে যাচ্ছিলাম—চামচিকে—কিন্তু তার আগেই সায়েব হাঁইমাই করে চেঁচিয়ে উঠল। নাকের দিকে চামচিকের এত নজর কেন কে জানে—ঠিক সায়েবের নাকেই একটা ঝাপটা মেরে চলে গেল।

—ওটা কী পাখি ? কী বদখৎ দেখতে!—সায়েব কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। চুনকাম-করা মুখটা তার ভয়ে পানসে হয়ে গেছে।

আমি বুঝলাম, এই মওকা! বললাম, তুমি কি ও পাখি কখনো গ্যাখোনি ?

—নো, নেভার! আমি মাত্র দু-মাস আগে আফ্রিকা থেকে ইণ্ডিয়ায় এসেছি। সিংহ দেখেছি—গণ্ডার দেখেছি—কিন্তু—

সায়েব শেষ করতে পারল না।

চামচিকেটা আর একবার পাক খেয়ে গেল। একটু হলেই প্রায় খিমচে ধরেছিল সায়েবের মুখ। বোধহয় ভেবেছিল ওটা চালকুমড়ো।

সায়েব বললে, মিস্টার—ও কি কামড়ায়?

আমি বললাম, মোক্ষম! ভীষণ বিষাক্ত! এক কামড়েই লোক মারা যায়! এক মিনিটের মধ্যেই!

—হোয়াট!—বলে সায়েব লাফিয়ে উঠল। তারপরে আমার কম্বল ধরে টানাটানি করতে লাগল:—মিস্টার, প্লীজ—ফর গডস্ সেক—আমাকে একটা কম্বল দাও!

—তারপর আমি ওর কামড়ে মারা যাই আর কি! ও সব চলবে না।—আমি শক্ত করে কম্বল চেপে রইলাম।

—অ্যাঁ! তাহলে!—বলেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল সায়েব। বোঁ করে একেবারে চেন ধরে ঝুলে পড়ল প্রাণপণে। তারপর জানলা খুলে দিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল: হেল্‌প্—হেল্‌প্—আর খোলা জানলা পেয়েই সায়েবের কাঁধের ওপর দিয়ে বাইরের অন্ধকারে চামচিকে ভ্যানিশ।

সায়েব খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল। একটু দম নিয়ে মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, যাক—স্যাম্‌সিকেটা বাইরে চলে গেছে! এখন আর ভয় নেই—কী বলো?

আমি বললাম, না, তা নেই। তবে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দেবার জন্যে তৈরি থাকো।

সায়েবের মুখ হাঁ হয়ে গেল।—কেন?

—বিনা কারণে চেন টেনেছ, গাড়ি থামল বলে। আর শোন সায়েব —চামচিকে খুব লক্ষ্মী পাখি। কাউকে কামড়ায় না—কাউকে কিছু বলে না। তুমি রেলের কর্মচারী হয়ে চামচিকে দেখে চেন টেনেছ—এজন্যে তোমার শুধু ফাইন নয়—চাকরিও যেতে পারে।

ওদিকে গাড়ি আস্তে আস্তে থেমে আসছে তখন। মিস্টার রাইনোসেরাস কেমন মিটমিট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে। ভয়ে এখন প্রায় মিস্টার হেয়ার—মানে খরগোস হয়ে গেছে।

তারপরই আমার ডান হাত চেপে ধরল দু-হাতে ঃ

—শোন মিস্টার, আজ থেকে তুমি আমার বুজম ফ্রেণ্ড! মানে প্রাণের বন্ধু! তোমাকে আমি ফার্স্ট ক্লাস সেলুনে নিয়ে যাচ্ছি—দেখবে তোফা ঘুম হবে। হাওড়ায় নিয়ে গিয়ে কেলনারের ওখানে তোমাকে পেট ভরে খাইয়ে দেব। শুধু গার্ড এলে বলতে হবে, গাড়িতে একটা গুণ্ডা পিস্তল নিয়ে ঢুকেছিল, তাই আমরা চেন টেনেছি। বল—রাজি?

রাজি না হয়ে আর কী করি! এত কষ্ট করে অনুরোধ করছে যখন!

বিজয়গর্বে হাসল টেনিদা ঃ যা ক্যাবলা—আরো চার পয়সার পাঁটার ঘুগনি নিয়ে আয়—

———

ঢাউস

চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে টেনিদা বললে, ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোকিলিস ইয়াক্ ইয়াক্!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, তার মানে কী?

টেনিদা টক-টক করে আমার মাথার ওপর দুটো টোকা মারল। বললে, তোর মগজ-ভর্তি খালি শুকনো ঘুঁটে—তুই এ-সব বুঝবিনি। এ হচ্ছে ফরাসী ভাষা।

আমার ভারি অপমান বোধ হল।

—ফরাসী ভাষা? চালিয়াতির জায়গা পাওনি? তুমি ফরাসী ভাষা কী করে জানলে?

টেনিদা বললে, আমি সব জানি।

—বটে?—আমি চটে বললুম, আমিও তাহলে জার্মান ভাষা জানি।

—জার্মান ভাষা?—টেনিদা নাক কুঁচকে বললে, বল্ তো?

আমি তক্ষুনি বললুম, হিটলার—নাৎসী—বার্লিন—কটাকট্!

হাবুল সেন বসে বসে বেলের আটা দিয়ে একমনে একটা ছেঁড়া ঘুড়িতে পট্টি লাগাচ্ছিল। এইবারে মুখ তুলে ঢাকাই ভাষায় বললে, হঃ, কী জার্মান ভাষাডাই কইলি রে প্যালা! খবরের কাগজের কতগুলিন্ নাম—তার লগে একটা 'কটাকট্' জুইড়্যা দিয়া খুব ওস্তাদি কোরতে আছস্! আমি একটা ভাষা কমু? ক দেখি—'মেকুরে হুড়ুম খাইয়া হকৈড় করছে'—এইডার মানে কী?

টেনিদা ঘাবড়ে গিয়ে বললে, সে আবার কী রে! ম্যাডাগাস্কারের ভাষা বলছিস বুঝি?

—ম্যাডাগাস্কার না হাতি!—বিজয়গর্বে হেসে হাবুল বললে, মেকুর কিনা বিড়াল, হুড়ুম খাইয়া কি না মুড়ি খাইয়া—হক্কৈড় করছে—মানে এঁটো করেছে।

হেরে গিয়ে টেনিদা ভীষণ বিরক্ত হল।

—রাখ্ বাপু তোর হুড়ুম দুড়ুম্—শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়! এর চাইতে প্যালার জার্মান 'কটাকট্'ও ঢের ভালো!

বলতে বলতে ক্যাবলা এসে হাজির। চোখ প্রায় আদ্ধেকটা বুজে খুব মন দিয়ে কি যেন চিবুচ্ছে। দেখেই টেনিদার চোখদুটো জুল-জুল করে উঠল।

—অ্যাই, খাচ্ছিস কী রে?

আরো দরদ দিয়ে চিবুতে চিবুতে ক্যাবলা বললে, চুয়িং গাম।

—চুয়িং গাম!—টেনিদা মুখ বিচ্ছিরি করে বললে, দুনিয়ায় এত খাবার জিনিস থাকতে শেষে রবার চিবুচ্ছিস বসে বসে! এর পরে জুতোর সুখতলা খাবি এই তোকে বলে দিলুম। ছ্যাঃ!

আমি বললুম, চুয়িং গাম থাক। কাল যে বিশ্বকর্মা পুজো —সেটা খেয়াল নেই বুঝি?

টেনিদা বললে, খেয়াল থাকবে না কেন? সেইজন্যেই তো বলছিলুম, ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—

ক্যাবলা পট করে বললে, মেফিস্টোফিলিস মানে শয়তান।

—শয়তান!—চটে গিয়ে টেনিদা বললে, থাম থাম, বেশি পণ্ডিতি করিসনি! সব সময় এই ক্যাবলাটা মাস্টারি করতে আসে! কাল যখন মেফিস্টোফিলিস ইয়াক্ ইয়াক্ করে আকাশে উড়বে—তখন টের পাবি।

—তার মানে ?—আমরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলুম।

—মানে ? মানে জানবি পরে—টেনিদা বললে, এখন বল দিকি, কাল বিশ্বকর্মা পুজোর কী রকম আয়োজন হল তোদের ?

আমি বললুম, আমি দু-ডজন ঘুড়ি কিনেছি।

হাবুল সেন বললে, আমি তিন ডজন।

ক্যাবলা চুয়িং গাম চিবুতে চিবুতে বললে, আমি একটাও কিনিনি। তোদের ঘুড়িগুলো কাটা গেলে আমি সেইগুলো ধরে ওড়াব।

টেনিদা মিট্‌ মিট্‌ করে হেসে বললে, হয়েছে, বোঝা গেছে তোদের দৌড়! আর আমি কী ওড়াব জানিস ? আমি—এই টেনি শর্মা ?—টেনিদা খাড়া নাকটাকে খাঁড়ার মতো উঁচু করে নিজের বুকে দুটো টোকা মেরে বললে, আমি যা ওড়াব—তা আকাশে বোঁ-বোঁ করে উড়বে, গোঁ গোঁ করে এরোপ্লেনের মতো ডাক ছাড়বে—হুঁ-হুঁ! ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি—

বাকিটা ক্যাবলা আর বলতে দিলে না। ফস্‌ করে বলে বসল ঃ ঢাউস ঘুড়ি বানিয়েছ বুঝি ?

—বানিয়েছ বুঝি ?—টেনিদা রেগে ভেংচে বললে, তুই আগে থেকে বলে দিলি কেন ? তোকে আমি বলতে বারণ করিনি ?

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, তুমি আমাকে ঢাউস ঘুড়ির কথা বললেই বা কখন, বারণই বা করলে কবে ? আমি তো নিজেই ভেবে বললুম।

—কেন ভাবলি ?—টেনিদা রকে একটা কিল মেরেই উঃ উঃ করে উঠল ঃ বলি, আগ বাড়িয়ে তোকে এ-সব ভাবতে বলেছে কে র‍্যা ? প্যালা ভাবেনি, হাবলা ভাবেনি—তুই কেন ভাবতে গেলি ?

হাবুল সেন বললে, হ, ওইটাই ক্যাবলার দোষ! এত ভাইব্যা ভাইব্যা শ্যাষে একদিন ও কবি হইবো।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, হুঁ, কবি হওয়া খুব খারাপ! আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা একবার কবি হয়েছিল। দিনরাত কবিতা লিখত। একদিন রামধন ধোপার খাতায় কবিতা করে লিখল:

পাঁচখানা ধুতি, সাতখানা শাড়ি
এ-সব হিসাবে হইবে কিবা?
এ জগতে জীব কত ব্যথা পায়
তাই ভাবি আমি রাত্রি দিবা।
রামধনের ওই বৃদ্ধ গাধা
মনটি তাহার বড়ই সাদা—
সে-বেচারা তার পিঠেতে চাপায়ে
কত শাড়ি ধুতি প্যান্ট লইয়া যায়—
মনোদুখে খালি বোঝা টেনে ফেরে গাধা
একখানা ধুতি-প্যান্ট পরিতে না পায়!

টেনিদা বললে, আহা-হা, বেশ লিখেছিল তো! শুনে চোখে জল আসে!

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, হ, খুবই করুণ।

আমি বললুম, কবিতাটা পড়ে আমারও খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পিসিমা ধোপার হিসেবের খাতায় এইসব দেখে ভীষণ রেগে গেল। রেগে গিয়ে হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একটা চালকুমড়ো নিয়ে ফুচুদাকে তাড়া করলে। ঠিক যেন গদা হাতে নিয়ে শাড়িপরা ভীম দৌড়চ্ছে!

টেনিদা বললে, তোর পিসিমার কথা ছেড়ে দে—ভারি

বেরসিক। কিন্তু কী প্যাথেটিক কবিতা যে শোনালি প্যালা—মনটা একেবারে মজে গেল! ঈস্—সত্যিই তো! গাধা কত ধুতি-প্যাণ্ট-শাড়ি টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু একখানা পরিতে না পায়!—বলে টেনিদা উদাস হয়ে দূরের একটা শালপাতার ঠোঙার দিকে তাকিয়ে রইল।

সান্ত্বনা দিয়ে হাবুল বললে, মন খারাপ কইর‍্যা আর করবা কী। এইরকম হয়। দ্যাখ না—গোবর হইল গিয়া গোরুর নিজের জিনিস, অন্য লোকে তাই দিয়া ঘুঁইট্যা দেয়। গোরু একখানা ঘুঁইট্যা দিতে পারে না।

দাঁত খিঁচিয়ে টেনিদা বললে, দিলে সব মাটি করে! এমন একটা ভাবের জিনিস—ধাঁ করে তার ভেতর গোবর আর ঘুঁটে নিয়ে এল! নে—ওঠ্ এখন, ঢাউস ঘুড়ি দেখবি চল্!

—ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্ ইয়াক ইয়াক—

বলতে বলতে আমরা যখন গড়ের মাঠে পৌছুলুম তখন সবে সকাল হচ্ছে। চৌরঙ্গির এদিকে সূর্য উঠছে আর গঙ্গার দিকটা লালে লাল হয়ে গেছে। দিব্যি ঝির্-ঝির্ করে হাওয়া দিচ্ছে—কখনো কখনো বাতাসটা বেশ জোরালো। চারদিকে নতুন ঘাসে যেন ঢেউ খেলছে। সত্যি বলছি—আমি পটলডাঙার প্যালা-রাম, পটোল দিয়ে শিঙ্গি মাছের ঝোল খাই—আমারই ফুচুদার মতো কবি হতে ইচ্ছে হল।

কখন যে সুর করে গাইতে শুরু করেছি—রবি মামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ওই,—সে আমি নিজেই জানিনে। হঠাৎ মাথার ওপর কটাং করে গাঁট্টা মারল টেনিদা।

—অ্যাই সেরেছে! এটা যে আবার গান গায়!

—তাই বলে তুমি আমার মাথার ওপর তাল দেবে নাকি—আমি চটে গেলুম।

—তাল বলে তাল! আবার যদি চামচিকের মতো চিঁ চিঁ করবি, তাহলে তোর পিঠে গোটা-কয়েক ঝাঁপতাল বসিয়ে দেব সে বলে দিচ্ছি! এসেছি ঘুড়ি ওড়াতে—উনি আবার সুর ধরেছেন!

আমার মনটা বেজায় বিগড়ে গেল। খামোকা সকালবেলায় নিরীহ ব্রাহ্মণ-সন্তানের মাথায় গাঁট্টা মারলে! মনে-মনে অভিশাপ দিয়ে বললুম, হে ভগবান, তুমি ওড়বার আগেই একটা খোঁচা-টোঁচা দিয়ে টেনিদার ঢাউস ঘুড়ির ঢাউস পেটটা ফাঁসিয়ে দাও! ওকে বেশ করে আক্কেল পাইয়ে দাও একবার!

ভগবান বোধহয় সকালে দাঁতন করতে করতে গড়ের মাঠে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আমার প্রার্থনা যে এমন করে তাঁর কানে যাবে—তা কে জানত!

ওদিকে বিরাট ঢাউসকে আকাশে ওড়াবার চেষ্টা চলছে তখন। টেনিদা দড়ির মস্ত লাটাইটা ধরে আছে—আর হাবুল সেন হাঁপাতে হাঁপাতে প্রকাণ্ড ঢাউসটাকে ওপরে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু ঢাউস উড়ছে না—ধপাৎ করে নিচে পড়ে যাচ্ছে।

টেনিদা ব্যাজার হয়ে বললে, এ কেমন ঢাউস রে! উড়ছে না যে!

হাবুল সেন মাথা নেড়ে বললে, হ, এইখান উড়বো না। এইটার থিক্যা মনুমেণ্ট উড়ান সহজ!

শুনে আমার যে কী ভালো লাগল! খামোকা ব্রাহ্মণের চাঁদিতে গাঁট্টা মারা! হুঁ-হুঁ! যতই পটোল দিয়ে সিঙ্গি মাছের ঝোল খাই, ব্রাহ্মতেজ যাবে কোথায়! ও ঘুড়ি আর উড়ছে না—দেখে নিয়ো!

খালি ক্যাবলা মিট-মিট করে হাসল। বললে, ওড়াতে জানলে সব ঘুড়িই ওড়ে।

—ওড়ে নাকি ? টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তবে দে না উড়িয়ে !

ক্যাবলা বললে, তোমার ঘুড়ি তুমি ওড়াবে, আমি ও-সবের মধ্যে নেই। তবে, বুদ্ধিটা বাতলে দিতে পারি। অত নিচ থেকে অত বড় ঘুড়ি ওড়ে ? ওপর থেকে ছাড়লে তবে তো হাওয়া পাবে। ওই বটগাছটার ডাল দেখছ ? ওখানে উঠে ঘুড়িটা ছেড়ে দাও। ডালটা অনেকখানি এদিকে বেরিয়ে এসেছে—ঘুড়ি গাছে আটকাবে না—ঠিক বোঁ করে উঠে যাবে আকাশে।

টেনিদা বললে, ঠিক। এ-কথাটা আমিই তো ভাবতে যাচ্ছিলুম। তুমি আগে থেকে ভাবলি কেন র‍্যা? ভারি বাড় বেড়েছে—না? তোকে পানিশ্‌মেণ্ট দিলুম। যা গাছে ওঠ্—

ক্যাবলা বললে, বা-রে! লোকের ভালো করলে বুঝি এমনিই হয় ?

দাঁত খিচিয়ে টেনিদা বললে, তোকে ভালো করতে কে বলেছিল—শুনি ? দুনিয়ায় কারো ভালো করেছিস কি মরেছিস। যা—গাছে ওঠ্—

—যদি কাঠপিঁপড়ে কামড়ায় ?

—কামড়াবে। আমাদের বেশ ভালোই লাগবে।

—যদি ঘুড়ি ছিঁড়ে যায় ?

—তোর কান ছিঁড়বে। যা ওঠ্ বলছি—

কী আর করে—যেতেই হল ক্যাবলাকে। যাওয়ার সময় বললে, ঘুড়ির দড়িটা ওই গোলপোস্টে বেঁধে দিয়ো টেনিদা। অত বড় ঢাউস—খুব জোর টান দেবে কিন্তু।

টেনিদা নাক কুঁচকে মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, যা—যা—বেশি বকিসনি! ঘুড়ি উড়িয়ে উড়িয়ে বুড়ো হয়ে গেলুম—তুই এসেছিস ওস্তাদি করতে! নিজের কাজ কর—

ক্যাবলা বললে, বহুৎ আচ্ছা।

হু-হু করে হাওয়া বইছে তখন। ডালের ডগায় উঠে ক্যাবলা ঢাউসকে ছেড়ে দিলে। সঙ্গে-সঙ্গে গোঁ-গোঁ করে ডাক ছেড়ে সেই পেল্লায় ঢাউস আকাশে উড়ল।

টেনিদার ওপর সব রাগ ভুলে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছি। কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে ঢাউসকে! মাথার দুধারে দুটো পতাকা যেন বিজয়গর্বে পত্-পত্ উড়ছে—গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে ঘুড়ি ওপরে উঠে যাচ্ছে। টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল: ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি—

কিন্তু আচমকা টেনিদার চ্যাঁচানি বন্ধ হয়ে গেল। আর হাঁউ-মাউ করে ডাক ছাড়ল হাবুল।

—গেল—গেল—

কে গেল? কোথায় গেল?

কে আর যাবে! অমন করে কেই বা যেতে পারে টেনিদা ছাড়া? তাকিয়ে দেখে আমার চোখ চড়াৎ করে কপালে উঠে গেল! কপালে বললেও ঠিক হয় না, সোজা ব্রহ্মতালুতে!

শুধু ঢাউসই ওড়েনি। সেইসঙ্গে টেনিদাও উড়ছে। চালিয়াতি করে লাটাই ধরে রেখেছিল হাতে, বাঘা ঢাউসের টানে সোজা হাত-দশেক উঠে গেছে ওপরে।

এক লাফে গাছ থেকে নেমে পড়ল ক্যাবলা। বললে, পাকড়ো—পাকড়ো—

কিন্তু কে কাকে পাকড়ায়! ততক্ষণে টেনিদা পনেরো হাত

ওপরে। সেখান থেকে তার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে ঃ হাবুল রে —প্যালা রে—ক্যাবলা রে—

আমরা তিনজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম ঃ—ছেড়ে দাও—লাটাই ছেড়ে দাও—

টেনিদা কাঁউ-কাঁউ করে বললে, পড়ে যে হাত-পা ভাঙব !

হাবুল বললে, তবে আর কী করবা ! উইড়্যা যাও—

ঢাউস তখন আরো ওপরে উঠেছে। জোরালো পুবের হাওয়ায় সোজা পশ্চিম-মুখো ছুটেছে গোঁ-গোঁ করতে করতে। আর জালের সঙ্গে মাকড়সা যেমন করে ঝোলে, তেমনি করে মহাশূন্যে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে টেনিদা।

পেছনে পেছনে আমরাও ছুটলুম। সে কী দৃশ্য ! তোমরা কোনো রোমাঞ্চকর সিনেমাতেও তা দ্যাখোনি !

ওপর থেকে তারস্বরে টেনিদা বললে, কোথায় উড়ে যাচ্ছি বল তো ?

ছুটতে ছুটতে আমরা বললুম, গঙ্গার দিকে।

—অ্যাঁ !—ত্রিশূন্য থেকে টেনিদা কেঁউ-কেঁউ করে বললে, গঙ্গায় পড়ব নাকি ?

হাবুল বললে, হাওড়া স্টেশনেও যাইতে পারো !

—অ্যাঁ !

আমি বললুম, বর্ধমানেও নিয়ে যেতে পারে !

—বর্ধমান ! বলতে বলতে শূন্যে একটা ডিগবাজি খেয়ে গেল টেনিদা।

ক্যাবলা বললে, দিল্লী গেলেই বা আপত্তি কী ? সোজা কুতুব মিনারের চুড়োয় নামিয়ে দেবে এখন।

টেনিদা তখন প্রায় পঁচিশ হাত ওপার। সেখান থেকে

গোঙাতে গোঙাতে বললে, এ যে আরো উঠছে! দিল্লী গিয়ে থামবে তো? ঠিক বলছিস?

আমি ভরসা দিয়ে বললুম, না থামলেই বা ভাবনা কী? হয়ত মঙ্গল-গ্রহেও নিয়ে যেতে পারে।

—মঙ্গল-গ্রহ!—আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে টেনিদা বললে, আমি মঙ্গল-গ্রহে এখন যেতে চাচ্ছি না। যাওয়ার কোনো দরকার দেখছি না!

ক্যাবলা বললে, তবু যেতেই হচ্ছে। যাওয়াই তো ভালো টেনিদা! তুমিই বোধহয় প্রথম মানুষ যে মঙ্গল-গ্রহে যাচ্ছ। আমাদের পটলডাঙার কত বড় গৌরব সেটা ভেবে খ্যাখো!

—চুলোয় যাক পটলডাঙা! আমি—কিন্তু টেনিদা আর বলতে পারলে না, তক্ষুনি শূন্যে আর একটা ডিগবাজি খেলে। খেয়েই আবার কাঁউ-কাঁউ করে বললে, ঘুরপাক খাচ্ছি যে। আমি মোটেই ঘুরতে চাচ্ছি না—তবু বোঁ-বোঁ করে ঘুরে যাচ্ছি!

ঘুড়ি তখন ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের কাছাকাছি। আমরা সমানে পেছনে ছুটছি। ছুটতে ছুটতে আমি বললুম, ও-রকম ঘুরতে হয়। ওকে মাধ্যাকর্ষণ বলে। সায়েন্স পড়োনি?

অনেক ওপর থেকে টেনিদা যেন কী বললে। আমরা শুনতে পেলুম না। কেবল কাঁউ-কাঁউ করে খানিকটা আওয়াজ আকাশ থেকে ভেসে এল।

কিন্তু ওদিকে ঢাউস যত গঙ্গার দিকে এগোচ্ছে তত হাওয়ার জোরও বাড়ছে। পেছনে ছুটে আমরা আর কুলিয়ে উঠতে পারছি না। টেনিদা উড়ছে আর ডিগবাজি খাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে আর উড়ছে।

স্ট্র্যাণ্ড রোড এসে পড়ল প্রায়। ঘুড়ি সমানে ছুটে চলেছে।

এখুনি গঙ্গার ওপরে চলে যাবে। আমাদের লীডার যে সত্যিই —গঙ্গা পেরিয়ে—বর্ধমান হয়ে—দিল্লী ছাড়িয়ে মঙ্গল-গ্রহেই চলল! আমরা যে অনাথ হয়ে গেলুম!

আকাশ থেকে টেনিদা আবার আর্তস্বরে বললে: সত্যি বলছি—আমি মঙ্গল-গ্রহে যেতে চাই না—কিছুতেই যেতে চাই না—

আমরা এইবারে একবাক্যে বললুম, না—তুমি যেয়ো না!

—কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে যে!

—তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো!—ক্যাবলা জানিয়ে দিলে।

—আর পৌঁছেই একটা চিঠি লিখো—আমি আরো মনে করিয়ে দিলুম: চিঠি লেখাটা খুব দরকার।

টেনিদা বোধহয় বলতে যাচ্ছিল নিশ্চয়ই চিঠি লিখবে, কিন্তু পুরোটা আর বলতে পারল না! একবার কাঁউ করে উঠেই কোঁক্ করে থেমে গেল। আমরা দেখলুম, ঢাউস গোঁত্তা খাচ্ছে।

সে কী গোঁত্তা! মাথা নিচু করে বোঁ-বোঁ শব্দে নামছে তো নামছেই। নামতে নামতে একেবারে—ঝপাস করে সোজা গঙ্গায়। মঙ্গল-গ্রহে আর গেল না—মত বদলে পাতালের দিকেই রওনা হল।

আর টেনিদা? টেনিদা কোথায়? সেও কি ঘুড়ির সঙ্গে গঙ্গায় নামল?

না—গঙ্গায় নামে নি। টেনিদা আটকে আছে। আটকে আছে আউটরাম ঘাটের একটা মস্ত গাছের মগডালে। আর বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে একদল কাক কা-কা করে টেনিদার চারপাশে চক্কর দিচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে আমরা গাছতলায় এসে হাজির হলুম। কেবল আমরাই নই। চারদিক থেকে তখন প্রায় শ-দুই লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। পোর্ট কমিশনারের খালাসি, নৌকোর মাঝি, দুটো সাহেব—তিনটে মেম।

—ওঃ মাই—হোয়াজ্ জ্যাট্ (হোরাট্স্ দ্যাট্)?—বলেই একটা মেম ভিরমি গেল।

কিন্তু তখন আর মেমের দিকে কে তাকায়? আমি চেঁচিয়ে বললুম, টেনিদা, তাহলে মঙ্গল-গ্রহে গেলে না শেষ পর্যন্ত?

টেনিদা ঢাউস ঘুড়ির মতো গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে বললে, কাকে ঠোকরাচ্ছে!

—নেমে এস তাহলে।

টেনিদা গাঁ-গাঁ করে বললে, পারছি না! ওফ্—কাকে মাথা ফুটো করে দিলে রে প্যালা!

পোর্ট কমিশনারের একজন কুলি তখুনি ফায়ার-বিগ্রেডে টেলিফোন করতে ছুটল। ওরাই এসে মই বেয়ে নামিয়ে আনবে।

চাটুজ্জেদের রকে বসে আমি বললুম, ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি—

সারা গায়ে আইডিন-মাখানো টেনিদা কাতর স্বরে বললে, থাক, ও আর বলিসনি! তার চাইতে একটা করুণ কিছু বল্। তোর ফুচুদার লেখা 'রামধনের ওই বৃদ্ধ গাধা'র কবিতাটাই শোনা। ভারি প্যাথেটিক! ভারি প্যাথেটিক!

———

কুট্‌টিমামার হাতের কাজ

চিড়িয়াখানার কালো ভালুকটার নাকে একদিক থেকে খানিকটা রোঁয়া উঠে গেছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে আমাদের পটলডাঙার টেনিদা বললে, বল তো প্যালা—ভালুকটার নাকের ও দশা কী করে হল ?

আমি বললাম, বোধহয় নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে, তাই—

টেনিদা বললে, তোর মুণ্ডু !

—তাহলে বোধহয় চিড়িয়াখানার লোকেরা নাপিত ডেকে কামিয়ে দিয়েছে। মানুষ যদি গোঁফ কামায়, তাহলে ভালুকের আর দোষ কী ?

—থাম্‌ থাম্‌—বাজে ফ্যাক্‌-ফ্যাক্‌ করিসনি ! টেনিদা চটে গিয়ে বললে, যদি এখন এখানে কুট্‌টিমামা থাকত, তাহলে বুঝতিস, সব জিনিস নিয়ে ইয়ার্কি চলে না।

—কে কুট্‌টিমামা ?

—কে কুট্‌টিমামা !—টেনিদা চোখদুটোকে পাটনাই পেঁয়াজের মতো বড় বড় করে বললে, তুই গজগোবিন্দ হালদারের নাম শুনিসনি ?

—কক্ষনো না—আমি জোরে মাথা নাড়লাম ঃ কোনদিনই না ! গজগোবিন্দ ! অমন বিচ্ছিরি নাম শুনতে বয়ে গেছে আমার !

—বটে ! খুব যে তড়পাচ্ছিস দেখছি ! জানিস, আমার

কুট্টিমামা আস্ত একটা পাঁটা খায়? তিন সের রসগোল্লা ফুঁকে দেয় তিন মিনিটে?

—তাতে আমার কী! আমি তো তোমার কুট্টিমামাকে কোনদিন নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছি না! প্রাণ গেলেও না।

—তা করবি কেন! এমন একটা জাঁদরেল লোকের পায়ের ধুলো পড়বে তোর বাড়িতে—অমন কপাল করেছিস নাকি তুই? পালা জ্বরে ভুগিস আর সিঙ্গি মাছের ঝোল খাস—কুট্টিমামার মর্ম তুই কী বুঝবি র‍্যা? জানিস, কুট্টিমামার জন্যেই ভালুকটার ওই অবস্থা?

এবারে চিন্তিত হলাম।

—তা তোমার কুট্টিমামার এসব বদ্ খেয়াল হল কেন? কেন ভালুকের নাক কামিয়ে দিতে গেল খামোকা? তার চাইতে নিজের মুখ কামালেই তো ঢের বেশি কাজ দিত।

—চুপ কর্ প্যালা, আর বাজে বকালে রদ্দা খাবি—টেনিদা সিংহনাদ করল। আর তাই শুনে ভালুকটা বিচ্ছিরি রকম মুখ করে আমাদের ভেংচে দিলে।

টেনিদা বললে, দেখলি তো! কুট্টিমামার নিন্দে শুনে ভালুকটা পর্যন্ত কেমন চটে গেল!

এবার আমার কৌতূহল ঘন হতে লাগল।

—তা ভালুকটার সঙ্গে তোমার কুট্টিমামার আলাপ হল কী করে?

—আরে সেইটেই তো গল্প। দারুণ ইন্টারেস্টিং!—হুঁ-হুঁ বাবা, এসব গল্প এমনি শোনা যায় না—কিছু রেস্ত খরচ করতে হয়। গল্প শুনতে চাস—আইসক্রীম খাওয়া।

অগত্যা কিনতেই হল আইসক্রীম।

চিড়িয়াখানার যেদিকটায় অ্যাট্‌লাসের মূর্তিটা রয়েছে, সেদিকে বেশ একটা ফাঁকা জায়গা দেখে আমরা এসে বসলাম। তারপর সারসগুলোর দিকে তাকিয়ে আইসক্রীম খেতে খেতে গল্প শুরু করল টেনিদা ঃ

আমার মামার নাম গজগোবিন্দ হালদার। শুনেই তো বুঝতে পারছিস ক্যায়সা লোক একখানা ! খুব তাগড়া জোয়ান ভেবেছিস বুঝি ? ইয়া ইয়া ছাতি—অ্যায়সা হাতের গুল ? উঁহু, মোটেই নয়। মামা একেবারে প্যাঁকাটির মতো রোগা—দেখলে মনে হয় হাওয়ায় উল্‌টে পড়ে যাবে। তার ওপর প্রায় ছ-হাত লম্বা—মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, দূর থেকে ভুল হয়, বুঝি একটা তালগাছ হেঁটে আসছে। আর রঙ ! তিন পোঁচ আলকাতরা মাখলেও অমন খোলতাই হয় না। আর গলার আওয়াজ শুনলে মনে করবি—ডজন-খানেক নেংটি ইঁদুর ফাঁদে পড়ে চিঁ-চিঁ করছে সেখানে।

সেবার কুট্‌টিমামা শিলিগুড়ি ইস্টিশনের রেলেওয়ে রেস্তোরাঁয় বসে সবে দশ প্লেট ফাউল কারি আর সের-তিনেক চালের ভাত খেয়েছে, এমন সময় গোঁ গোঁ করে একটা গোঙানি। তারপরেই চেয়ার-ফেয়ার উল্‌টে একটা মেমসায়েব ধপাৎ করে পড়ে গেল কাটা কুমড়োর মতো।

হৈ—হৈ—রৈ—রৈ ! হয়েছে কী, জানিস ? চা-বাগানের এক দঙ্গল সাহেব-মেম রেস্তোরাঁয় বসে খাচ্ছিল তখন। মামার খাওয়ার বহর দেখে তাদের চোখ তো উল্‌টে গেছে আগেই, তারপর আবার দশ প্লেট খাওয়ার পরে মামা যখন আরো দু প্লেটের অর্ডার দিয়েছে, তখন আর সইতে পারেনি।

—ও গড হেল্‌প মি, হেল্‌প মি—বলে তো একটা মেম ঠায়

অজ্ঞান। আর তোকে তো আগেই বলেছি—মামার চেহারাখানা, কী বলে—তেমন ইয়ে নয়!

মামার চক্ষুস্থির!

দলে গোটা-চারেক সাহেব—কাশীর ষাঁড়ের মতো তারা ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা। কুট্‌টিমামা ভাবলে, ওরা সবাই মিলে পিটিয়ে বুঝি পাটকেল বানিয়ে দেবে! মামা জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে পৈতে খুঁজতে লাগল—দুর্গা নাম জপ করবে। কিন্তু সে পৈতে কি আর আছে? পিট চুলকোতে গিয়ে কবে তার বারোটা বেজে গেছে।

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে দুটো সাহেব তখন এগিয়ে আসছে তার দিকে। প্রাণপণে দেঁতো হাসি হেসে মামা বললে, ইট ইজ নট মাই দোষ স্যার—আই একটু বেশি ইট স্যার—

কুট্‌টিমামার বিদ্যে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত কিনা, তাও তিনবার ফেল। তাই ইংরেজি এর বেশি এগুলো না।

তাই শুনে সায়েবগুলো ঘোঁ—ঘোঁ—ঘুঁক্—ঘুঁক্—হোয়া হোয়া করে হাসল। আর মেমেরা খিঁ—খিঁ—পিঁ—পিঁ—চিঁ—হিঁ—হিঁ করে হেসে উঠল। ব্যাপার দেখে শুনে তাজ্জব লেগে গেল কুট্‌টিমামার।

অনেকক্ষণ হোয়া—হোয়া করবার পরে একটা সায়েব এসে কুট্‌টিমামার হাত ধরল। কুট্‌টিমামা তো ভয়ে কাঠ—এই বুঝি হ্যাঁচকা মেরে চিৎ করে ফেলে দিলে! কিন্তু মোটেই তা নয়, সায়েব কুট্‌টিমামার হ্যাণ্ডশেক করে বললে, মিস্টার বেঙ্গালী, কী নাম তোমার?

কুট্‌টিমামার ধড়ে সাহস ফিরে এল। যা থাকে কপালে ভেবে বলে ফেলল নামটা।

—গাঁজা-গাবিণ্ডে হ্যালডার? বাঃ, খাসা নাম। মিস্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে, তুমি চাকুরি করবে?

চাকরি! এ যে মেঘ না চাইতেই জল! কুট্টিমামা তখন টো-টো কোম্পানির ম্যানেজার—বাপের, অর্থাৎ আমার দাদুর বিনা পয়সার হোটেলে রেগুলার খাওয়া-দাওয়া চলছে। কুট্টিমামা খানিকক্ষণ হাঁ করে রইল।

সায়েবটা তাই দেখে হঠাৎ পকেট থেকে একটা বিস্কুট বের করে কুট্টিমামার হাঁ-করা মুখের মধ্যে গুঁজে দিল। মামা তো কেসে বিষম খেয়ে অস্থির! তাই দেখে আবার শুরু হল ঘোঁ—ঘোঁ—হোঁয়া—হোঁয়া—পিঁ—পিঁ—চিঁ—হিঁ—হিঁ! এবারে মেম পড়ে গেল চেয়ার থেকে!

হাসি-টাসি থামলে সেই সায়েবটা আবার বললে, হ্যালো মিস্টার বেঙ্গালী, আমরা আফ্রিকায় গেছি, নিউগিনিতে গেছি, পাপুয়াতেও গেছি। গরিলা, ওরাং, শিম্পাঞ্জি সবই দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো এমন একটি চিজ কোথাও চোখে পড়েনি। তুমি যদি আমাদের চা-বাগানে চাকরি নাও—তাহলে এক্ষুনি তোমায় দেড়শো টাকা মাইনে দেব। খাটনি বিশেষ কিছু নয়—শুধু বাগানের কুলিদের একটু দেখবে আর আমাদের মাঝে মাঝে খাওয়া দেখাবে।

এমন চাকরি পেলে কে ছাড়ে? কুট্টিমামা তক্ষুনি এক পায়ে খাড়া।

সায়েবরা মামাকে যেখানে নিয়ে গেল, তার নাম জঙ্গলঝোরা টী এস্টেট। মংপুর নাম শুনেছিস—মংপু? আরে, সেই যেখানে কুইনিন তৈরি হয় আর রবীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে কবিতা-টবিতা লিখতেন? জঙ্গলঝোরা টী এস্টেট তারই কাছাকাছি।

মামা তো দিব্যি আছে সেখানে। অসুবিধের মধ্যে মেশবার মতো লোকজন একেবারে নেই, তা ছাড়া চারদিকেই ঘন পাইনের জঙ্গল। নানারকম জানোয়ার আছে সেখানে, বিশেষ করে ভালুকের আস্তানা।

তা মামার দিন ভালোই কাটছিল। শস্তা মাখন, দিব্যি দুধ—খাঁটেল মুরগি। তা ছাড়া সায়েবরা মাঝে মাঝে হরিণ শিকার করে আনত, সেদিন মামার ডাক পড়ত খাওয়ার টেবিলে। একাই হয়ত একটা সম্বরের তিন সের মাংস মামা সাবাড় করে দিত, তাই দেখে টেবিল চাপড়ে উৎসাহ দিত সায়েবরা—হোঁয়া—হোঁয়া—হিঁ—হিঁ করে হাসত।

জঙ্গলঝোরা থেকে মাইল তিনেক হাঁটলে একটা বড় রাস্তা পাওয়া যায়। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে দার্জিলিঙে—বাসও পাওয়া যায় এখান থেকে। কুট্‌টিমামাকে বাগানে ফুট-ফরমাস খাটবার জন্যে প্রায়ই দার্জিলিঙে যেতে হত।

সেদিনও মামা দার্জিলিঙ থেকে বাজার নিয়ে ফিরছিল। কাঁধে একটা বস্তায় সের-তিনেক শুঁটকি মাছ, হাতে একরাশ জিনিস-পত্তর। কিন্তু বাস থেকে নেমেই মামার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

প্রথম কারণ, সন্ধে ঘোর হয়ে এসেছে—সামনে তিন মাইল পাহাড়ী রাস্তা। এই তিন মাইলের দু মাইলই আবার ঘন জঙ্গল। দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুস্থানী চাকর রামভরসার বাস স্ট্যাণ্ডে লণ্ঠন নিয়ে আসার কথা ছিল, সেও আসেনি। মামা একটু ফাঁপরেই পড়ে গেল বই কি।

কিন্তু আমার মামা গজগোবিন্দ হালদার অত সহজেই দমবার পাত্র নন। শুঁটকি মাছের বস্তা কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে

হাঁটতে শুরু করে দিলে। মামার আবার আফিং খাওয়ার অভ্যেস ছিল, তারই একটা গুলি মুখে পুরে দিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে পথ চলতে লাগল।

দু-ধারে পাইনের নিবিড় জঙ্গল আরো কালো হয়ে গেছে অন্ধকারে। রাশি-রাশি ফার্নের ভেতরে ভূতের হাজার হাজার চোখের মতো জোনাক জ্বলছে। ঝিঁ-ঝিঁ করে ঝিঁঝিঁর ডাক উঠছে। নিজের মনে রামপ্রসাদী সুরে গাইতে গাইতে কুট্টিমামা পথ চলেছে ঃ

নেচে নেচে আয় মা কালী
আমি যে তোর সঙ্গে যাব—
তুই খাবি মা পাঁটার মুড়ো
আমি যে তোর প্রসাদ পাব !

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছিল তখন। হঠাৎ মামার চোখে পড়ল, কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা লোক সেই বনের ভেতরে বসে কোঁ-কোঁ করছে।

আর কে! ওটা নির্ঘাৎ রামভরসা।

রামভরসার ম্যালেরিয়া ছিল। যখন-তখন যেখানে-সেখানে জ্বর এসে পড়ত। কিন্তু ওষুধ খেত না—এমনকি, এই কুইনিনের দেশে এসেও তার রোগ সারাবার ইচ্ছে ছিল না। রামভরসা তার ম্যালেরিয়াকে বড্ড ভালোবাসত। বলত, উ আমার বাপ-দাদার ব্যারাম আছেন। ওকে তাড়াইতে হামার মায়া লাগে।

কুট্টিমামার মেজাজ যদিও আফিংয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল তবু রামভরসাকে দেখে চিনতে দেরি হল না। রেগে বললে, তোকে না আমি বাস স্ট্যাণ্ডে যেতে বলেছিলুম ? আর তুই এই জঙ্গলের মধ্যে বসে কোঁ-কোঁ করছিস ? নে—চল্—

গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে রামভরসা উঠে দাঁড়াল।

কুট্‌টিমামা নাক কুঁচকে বললে, ইঃ, গায়ের কম্বলটা দেখ একবার! কী বদখৎ গন্ধ! কোনোদিন ধুসনি বুঝি? শেষে সে উকুন হবে ওতে! নে—চল্‌ ব্যাটা গাড়োল! আর এই শুঁট্‌কি মাছের পুঁটলিটাও নে। তুই থাকতে ওটা আমি বয়ে বেড়াব নাকি?

এই বলে মামা পুঁটুলিটা এগিয়ে দিলে রামভরসার দিকে।

—এঃ, হাত তো নয়, যেন নুলো বের করছে! থাক, ওতেই হবে।—মামা রামভরসার হাতে পুঁটলিটা গুঁজে দিলে জোর করে।

রামভরসা বললে, গোঁ—গোঁ—ঘোঁক্‌!

—ইস্‌-স্‌! সাহেবদের সঙ্গে থেকে খুব যে সায়েবি বুলি শিখেছিস দেখছি! চল্‌—এবার বাসামে ফিরে কুইনিন ইনজেকশন দিয়ে তোর ম্যালেরিয়া তাড়াব। দেখব কেমন সায়েব হয়েছিস তুই!

রামভরসা বললে, ঘুঁক্‌ ঘুঁক্‌।

—ঘুঁক্‌ ঘুঁক্‌? বাংলা-হিন্দী বলতে বুঝি আর ইচ্ছে করে না? চল্‌—পা চালা—

কুট্‌টিমামা আগে আগে, পিছে পিছে শুঁটকে মাছের পুঁটলি নিয়ে রামভরসা। মামা একবার পেছনে তাকিয়ে দেখলে কেমন থপাস্‌ থপাস্‌ হাঁটছে রামভরসা।

—ওঃ—খুব যে কায়দা করে হাঁটছিস! যেন বুট পরে বড় সায়েব হাঁটছেন!

রামভরসা বলল, ঘঁচাৎ।

—ঘঁচাৎ?—চল বাড়িতে, তোর কান যদি কচাৎ করে কেটে না নিয়েছি, তবে আমার নাম গজগোবিন্দ হালদারই নয়!

মাইল-খানেক হাঁটবার পরে কুট্টিমামার কেমন সন্দেহ হতে লাগল। পেছনে পেছনে থপ-থপ করে রামভরসা ঠিকই আসছে, কিন্তু কেমন কচর-মচর করে আওয়াজ হচ্ছে যেন। মনে হচ্ছে, কেউ যেন বেশ দরদ দিয়ে তেলেভাজা আর পাঁপড় চিবুচ্ছে। রামভরসা শুঁটকি মাছ খাচ্ছে নাকি? তা কী করে সম্ভব? রামভরসা রান্না-করা শুঁটকির গন্ধেই পালিয়ে যায়—কাঁচা শুঁটকি সে খাবে কী করে!

মামা একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল—কিন্তু বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। একে তো নেশায় চোখ প্রায় বুজে এসেছে, তারপর এদিকে একেবারে চাঁদের আলো নেই, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। শুধু দেখা গেল, পেছনে পেছনে সমানে থপ্‌থপিয়ে আসছে রামভরসা—ঠিক তেমনি গদাইলস্করী চালে।

পায়ের নিচে পাইনের অজস্র শুকনো কাঁটাওয়ালা পাতা ঝরে রয়েছে। মামা ভাবলে হয়ত তাই থেকেই আওয়াজ উঠছে এইরকম।

তবু মামা জিজ্ঞেস করলে, কিরে রামভরসা, শুঁটকি মাছগুলো ঠিক আছে তো?

রামভরসা জবাব দিলে, ঘুঁ—ঘুঁ!

—ঘুঁ—ঘুঁ? ইস্—আজ যে খুব ডাঁটে রয়েছিস দেখছি, যেন আদত বাস্তুঘুঘু!

রামভরসা বললে, হুঁ—হুঁ!

কুট্‌টিমামা বললে, সে তো বুঝতেই পারছি। আচ্ছা চল্ তো বাড়িতে, তারপর তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

আরো খানিকটা হাঁটবার পরে মামার বড্ড তামাকের তেষ্টা পেল। সামনে এখনো একটা খাড়া চড়াই, তার পর প্রায়

আধ মাইল নামতে হবে। একটু তামাক না খেয়ে নিলে আর চলছে না।

মামার বাঁ কাঁধে একটা চৌকিদারী গোছের ঝোলা ঝুলত সব সময়ে, তাতে জুতোর কালি, দাঁতের মাজন থেকে শুরু করে টিকে-তামাক পর্যন্ত সব থাকত। মামা জুত করে একখানা পাথরের ওপরে বসে পড়ল, তারপর কলকে ধরাতে লেগে গেল। রামভরসাও একটু দূরে ওত পেতে বসে পড়ল—আর ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়তে লাগল।

—হুঁ—হুঁ !

—সে তো জানি, তামাকে আর তোমার অরুচি আছে কবে ! আচ্ছা দাঁড়া, আমি একটু খেয়ে নিই, তারপর প্রসাদ দেব তোকে।

চোখ বুজে গোটা-কয়েক সুখ-টান দিয়েছে কুট্টিমামা—হঠাৎ আবার সেই কচর-মচর শব্দ। শুঁটকি মাছ চিবোনোর আওয়াজ—নির্ঘাত !

কুট্টিমামা এবারে অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর রাগে ফেটে পড়ল।

—তবে রে বেল্লিক, এই তোর ভণ্ডামি ? 'শুঁটকি মাছ আমি ছুঁতা নেহি—রাম রাম ?' দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে—

বলেই হুঁকো-টুকো নিয়ে মামা তেড়ে গেল তার দিকে।

তখন হঠাৎ আকাশ থেকে মেঘ সরে গেল, জ্বলজ্বলে একটা চাঁদ দেখা গেল সেখানে। একরাশ ঝকঝকে দাঁত বের করে রামভরসা বললে, ঘোঁক—ঘঁর্‌র্—ঘঁর্‌র্—

আর যাবে কোথায় ! হাতের আগুনশুদ্ধ হুঁকোটা রামভরসার নাকের ওপর ছুড়ে দিয়ে 'বাপরে—গেছিরে'—বলে কুট্টিমামার চিৎকার। তারপরেই ফ্ল্যাট—একদম অজ্ঞান।

রামভরসা নয়, ভালুক। আফিঙের ঘোরে মামা কিচ্ছুটি বুঝতে পারেনি। ভালুকের জ্বর হয়, জানিস তো ? তাই দেখে মামা ওকে রামভরসা ভেবেছিল। গায়ের কালো রোঁয়াগুলোকে ভেবেছিল কম্বল। আর শুঁটকি মাছের পুঁটলিটা পেয়ে ভালুক বোধহয় ভেবেছিল, এও তো মজা মন্দ নয়! সঙ্গে সঙ্গে গেলে আরো বোধহয় পাওয়া যাবে। তাই খেতে খেতে পেছনে পেছনে আসছিল। খাওয়া শেষ হলেই মামার ঘাড় মটকাত।

কিন্তু ঘাড়ে পড়বার আগেই নাকে পড়ল টিকের আগুন। ঘোঁৎ—ঘোঁৎ আওয়াজ তুলে ভালুক তিন লাফে পগার পার।

বুঝলি প্যালা—ওইটেই হচ্ছে সেই ভালুক।

গল্প শুনে আমি ঘাড় চুলকোতে লাগলাম ঃ

—কিন্তু ওইটেই যে সেই ভালুক—সেটা বুঝলে কী করে ?

—হুঁ-হুঁ, কুট্টিমামার হাতের কাজ, দেখলে কি ভুল হওয়ার জো আছে! আরে—আরে, ওই যে ডালমুট যাচ্ছে! ডাক—ডাক, শিগগির ডাক—

কাঁকড়াবিছে

চাটুজ্জেদের রকে আমি, টেনিদা আর হাবুল সেন বসে মোড়ের বুড়ো হিন্দুস্থানীর কাছ থেকে কিনে আনা তিনটে ভুট্টাপোড়া খুব তরিবত করে খাচ্ছিলুম। হঠাৎ কোত্থেকে লাফাতে লাফাতে ক্যাবলা এসে হাজির।

—ডি লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস! মেরেছি একটাকে!

কচর-কচর করে ভুট্টার দানা চিবুতে চিবুতে টেনিদা বললে, হঠাৎ এত লম্ফঝম্ফ যে? কী মেরেছিস? মাছি, না ছারপোকা?

—একটা মস্ত কাঁকড়াবিছে। দেওয়ালের ফুটো থেকে বেরিয়ে দিব্যি ল্যাজ তুলে আমাদের ছেদিলালকে কামড়াতে যাচ্ছিল। ছেদিলাল আপন মনে গান গাইতে গাইতে গোরু দোয়াচ্ছে, কিচ্ছু টের পায়নি। আমি দেখেই একটা ইট তুলে ঝাঁ করে মেরে দিলুম—ব্যস—ঠাণ্ডা!

টেনিদা মুখটাকে কুচোচিংড়ির মত সরু আর বিচ্ছিরি করে বললে, ফুঃ!

—ফুঃ মানে?—ক্যাবলা চটে গেল: কাঁকড়াবিছের সঙ্গে চালাকি নাকি? একবার কামড়ালেই বুঝতে পারবে!

—কাঁকড়াবিছের সঙ্গে চালাকি কে করতে যাচ্ছে? কিন্তু কলকাতায় কাঁকড়াবিছে? রাম রাম! ওরা তো ডেঁয়ো পিঁপড়ের বড়দা ছাড়া কিছু নয়! আসল কাঁকড়াবিছের কথা জানতে চাস তো আমার পচামামার গল্প শুনতে হবে।

গল্পের গন্ধে ক্যাবলা তড়াক করে রকে উঠে বসল।

হাবুল বললে, পচা মামা? এই নামটা এইবারে য্যান্ নূতন শুনতে আছি।

—কত শুনবি আরো, এখুনি হয়েছে কী!—ভুট্টার দানাগুলো শেষ করে টেনিদা এবার সবটা বেশ করে চেটে নিলে: আর যত শুনবি ততই চমকে যাবি!

আমি একবার মাথাটা চুলকে নিয়ে বললুম, একটা কথা জিজ্ঞেস করব টেনিদা?

ভুট্টার গোঁজটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে টেনিদা মোটা গলায় বললে, ইয়েস, পারমিশন দিচ্ছি।

—তোমার ক-টি মামা আছে সবশুদ্ধ্?

টেনিদা বললে, ফাইভ ফিফ্‌টিফাইভ। মানে পাঁচশো পঞ্চাশ জন।

আমি কাকের মতো হাঁ করে রইলুম, ক্যাবলা একটা খাবি খেল, আর হাবুল সেন ডুকরে উঠল: খাইছে!

—ইউ শাট্ আপ হাবলা, চিল্লাসনি! মামা কী রকম জানিস? ঠিক রেকারিং ডেসিমেলের মতো—মানে, শেষ নেই। মনে কর্ মা-র পিসতুতো ভাইয়ের বড়ো শালার মেজো ভায়রা—তাকে কী বলে ডাকব?

আমরা একবাক্যে বললুম, মামা।

—কিংবা মনে কর্, আমার কাকিমার মাসতুতো বোনের খুড়তুতো ভাইয়ের—

ক্যাবলা বললে, থাক, আর বলতে হবে না। মানে, মামা। বিশ্বময় মামা।

—রাইট! পচামামা সেই বিশ্বময় মামার একজন।

আমি অধৈর্য হয়ে বললুম, সে তো হল। কিন্তু কাঁকড়াবিছে—

টেনিদা দাঁত খিচিয়ে বললে, দাঁড়া না ঘোড়াডিম! আগে সব জিনিসটা ক্লীয়ার করে নিতে হবে না? কুরুবকের মতো বেশি বকবক করবি তো তোর কানের ওপর এখুনি একটা কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দেব!

হাবুল বললে, ছ্যাইড়া দাও—প্যালার কথা ছ্যাইড়া দাও! ওইটা একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু!

—কী আমার ঠাকুর্দা এলেন রে—আমি হাবুলকে ভেংচি কাটলুম।

টেনিদা আমার মাথায় টকাং করে একটা টোকা মেরে বললে, ইউ স্টপ! নাউ নো ঝগড়া! তাহলে দুই থাপ্পড় দিয়ে দুটোকেই তাড়িয়ে দেব এখান থেকে। এখন পচামামার গপ্প শুনে যা। খবরদার, ডিস্টার্ব করবিনে।

আমরা একবাক্যে বললুম, না—না।

—পচামামা, বুঝলি—একটা গলাখাঁকারি দিয়ে টেনিদা শুরু করলেঃ স্কুলে সাতবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছিল। আটবারের বার টেস্টেও যখন অ্যালাও হতে পারল না, তখন দাদু—মানে পচামামার বাবা তাকে পেল্লায় একটা চড় মেরে বললে, নিকালো আমার বাড়ি থেকে হতভাগা মুখ্যু, কুপুত্তুর, বোম্বেটে, অকালকুষ্মাণ্ড কোথাকার!

একসঙ্গে চার চারটে ওইরকম জবরদস্ত গাল, আর গালের ওপর অমনি একখানা, কী বলে—জাড্যাপহ চাঁটি—

আমি জিজ্ঞেস করলুমঃ জাড্যাপহ মানে কী?

—আমি কোত্থেকে জানব? শুনতে বেশ জাঁদরেল লাগে, তাই বললুম।

ক্যাবলা বলতে গেল : জাড্যাপহ, অর্থাৎ কিনা, যা জড়তা অপহরণ—

—চুপ কর্ ক্যাবলা—টেনিদা খেঁকিয়ে উঠল : তুই আর পণ্ডিতের মতো টিকটিক করিসনি ! ফের যদি বিদ্যে ফলাবি—আমি আর গল্প বলবই না। মুখে বলটু এঁটে বসে থাকব।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, না—না, আমরা আর কথা বলব না। গল্পটাই চলুক।

টেনিদা আবার শুরু করল : সেই জাড্যাপহ চাঁটি খেয়ে পচা-মামার মন উদাস হল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার নিকুচি করেছে—এমন অপমান সহ্য করা যায় ! পচামামা সেই রাতেই দেশান্তরী হল।

মানে বিদেশে আর যাবে কোথায়, তখনো পাকিস্তান হয়নি—সোজা দার্জিলিং মেলে উঠে পড়ল। নামল গিয়ে শিলিগুড়িতে। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে পাহাড় জঙ্গল ভেঙে, বাঙলা দেশের চৌহদ্দি পেরিয়ে একেবারে চলে গেল ভুটানে।

ইচ্ছে ছিল তিব্বতে গিয়ে অতীশ-দীপঙ্কর-টর হবে, কিন্তু একে বেজায় শীত, তায় ভুটান তখন লালে লাল।

—লালে লাল ?—ক্যাবলা জিজ্ঞেস করলে : ভুটানীরা খুব দোল খেলে বুঝি ?

—তোর মুণ্ডু ! লেবু—লেবু, কমলালেবু ! ভুটানী কমলা বিখ্যাত, জানিস তো ? আর পাহাড় আলো করে সব বাগান, তাতে হাজারে হাজারে ফল পেকে টুকটুক করছে, ঝরে পড়ছে গাছতলায়। যত খুশি কুড়িয়ে খাও, কেউ কিচ্ছুটি বলবে না। এমনকি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দুটো-চারটে ছিঁড়ে নিতে পারো—কে আর অত লক্ষ্য করতে যাচ্ছে !

মোদ্দা, ওই কমলালেবুর টানেই পচামামা ভুটানে আটকে

গেল। যেখানে সেখানে পড়ে থাকে আর পেটভরতি লেবু খায়। দেখতে দেখতে পচামামার ছিবড়ে বাদুড়চোষা চেহারাই পালটে গেল একদম। দাদু কিপটে লোক, তাঁর বাড়িতে পুঁইডাঁটা চচ্চড়ি কড়াইয়ের ডাল আর খলসে মাছের ঝাল খেয়ে খেয়ে পচামামার বুদ্ধি-টুদ্ধিগুলোতে মরচে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু কমলালেবুর রসে হঠাৎ সেগুলো চাঙা হয়ে উঠল।

ওদিকের সবচাইতে বুড়ো বাগানের মালিক হল পেম্বা-দোরজী-শিরিং। নামটা, কী বলে—একটু ইয়ে হলেও লোকটি বেশ ভালমানুষ। গোলগাল চেহারা, গায়ে ওদের সেই কালো আলখাল্লা, মাথায় কাঁচাপাকা চুলের লম্বা বিনুনি। মুখে পাঁচ-সাত গাছা দাড়ি, সব সময় মিঠে মিঠে হাসি, আর রাতদিন চমরী গাইয়ের জমাট দুধের টুকরো চুষছে। পচামামা তাকে গিয়ে মস্ত একটা সেলাম ঠুকে বললে, শিরিং সাহেব, আমি একজন বিদেশী।

শিরিং হেসে বললে, সে জানি। আজ পনেরো দিন ধরে তুমি আমার বাগানের লেবু খেয়ে আধাসাট করছ। কিন্তু আমরা অতিথিবৎসল বলে তোমায় কিছু বলিনি। ভুটিয়া হলে আমার এই কুকরি দিয়ে মুণ্ডুটি কচাৎ করে কেটে নিতুম।

শুনে পচামামার রক্ত জল হয়ে গেল। বললে, সাহেব, আমি খুব হাংগ্রি বলেই—

শিরিং চমরী গাইয়ের দুধের টুকরো মুখে পুরে বললে, ঠিক আছে, আমি কিছু মাইণ্ড করিনি। ওই তো তোমার বাঙালীর পেট, কীই বা তুমি খেতে পারো! এখন বলো, কী চাও?

—শিরিং সাহেব—পচামামা হাত কচলাতে কচলাতে বললে, শুধু কমলালেবু চালান দিয়ে কীই বা লাভ হয় আপনার?

—কম কী? লাখ খানেক।

—আজ্ঞে, এই লাখ টাকা যদি পাঁচ লাখ হয়?

শুনে শিরিং সাহেব নড়ে বসল: তা কী করে হতে পারে?

—আপনি অরেঞ্জ স্কোয়াশ, অর্থাৎ বোতল-ভরতি করে কমলালেবুর রস বিক্রি করুন। তাতে লাভ অনেক বেশি হবে।

শিরিং হাসল: এ আর নতুন কথা কী? এই তো মাইল-পাঁচেক দূরে ডিক্রুজ বলে এক সায়েব একটা কারখানা করেছে। সে তো জুত করতে পারছে না। বাজারে দারুণ কম্পিটিশন—কলকাতা বোম্বাইতে অনেক বড়ো বড়ো কোম্পানি, আমরা সুবিধে করতে পারব কেন?

পচামামা আবার একটা লম্বা সেলাম ঠুকল: যদি এমন অরেঞ্জ স্কোয়াশ তৈরি করতে পারি যা স্বাদে গন্ধে, যাকে বলে অতুলনীয়? মানে যা খেলে লোকে আর ভুলতে পারে না, একবার খেলে বার বার খেতে চায়?

—সে জিনিস তৈরি করবে কে? তুমি?

—চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—তুমি কি কেমিস্ট?

—আমি এম্. এস্. সি.।

পচামামা চাল মারল, বুঝতেই পারছিস। কিন্তু বিদেশে-বিভুঁয়ে এক আধটু ও-সব করতেই হয়, নইলে কাজ চলে না। পচামামা ভাবল, হুঁ-হুঁ—বাঙালীর ব্রেন—একটা কিছু করে ফেলবই।

শিরিং খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে কি ভাবল। তারপর বললে, বেশ, চেষ্টা করে দেখ।

—কিন্তু দিন পনেরো সময় দিতে হবে।

—পনেরো দিন কেন ?—শিরিং উৎসাহ দিয়ে বললে, এক মাস সময় দিচ্ছি। তুমি আমার আউস-হাউসে থাকো। এক্স্পেরিমেণ্টের জন্যে যা যা চাও সব দেব। যদি সাক্সেসফুল হতে পারো, তোমাকে কারখানার চীফ কেমিস্ট করে দেব, আর মাসে দু-হাজার টাকা করে মাইনে।

পচামামা এসে শিরিং সাহেবের আউট-হাউসে উঠল। সে কী রাজকীয় আয়োজন! এমন গদি-আঁটা বিছানায় পচা-মামাদের কেউ সাত জন্মেও শোয়নি। দুবেলা এমন ভালো ভালো খাবার খেতে লাগল যে তিন দিন পরে একবার করে পেটের অসুখে ভুগতে লাগল। আর সেইসঙ্গে চলল তার এক্স্পেরিমেণ্ট।

কখনো কমলালেবুর রসে আদা মেশাচ্ছে, কখনো মধু, কখনো চায়ের লিকার, কখনো ঝোলা গুড়, কখনো বা এক-আধ শিশি হোমিওপ্যাথিক ওষুধই ঢেলে দিচ্ছে—মানে, প্রাণে যা চায়। আর খেয়ে খেয়ে দেখছে। কোনদিন বা এক চামচে খেয়েই বমি করে ফেলল, কোনদিন মুখে দিতে না দিতেই তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, কোনদিন নেহাত মন্দ লাগল না, আর কোনদিন মুখ এমন টকে গেল—যে ঝাড়া আটচল্লিশ ঘণ্টা কিছু আর দাঁতে কাটতে পারে না।

এদিকে এক মাস যায়-যায়। শিরিং সাহেব মাঝে মাঝে খবর নেয়, কদ্দুর হল। পচামামা বুঝতে পারল, এভাবে পরস্মৈপদী রাজভোগ আর বেশিদিন চলবে না। এক মাসের ভেতর কিছু একটা করতে না পারলে এই খাওয়ার সুখ সুদে আসলে আদায় করে নেবে; পিটিয়ে তক্তা তো করে দেবেই, চাই কি কচাং করে মুণ্ডুটিও কেটে নিতে পারে।

পচামামা রাত জেগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, আর এক্স্পেরিমেণ্ট চালায়। তারপর একদিন মধু, আদা, হোমিও-প্যাথিক ওষুধ আর পিঁপড়ের ডিম মিশিয়ে যেই এক্স্পেরিমেণ্ট করেছে—

ওঃ, কী বলব তোদের, কী তার স্বাদ, কী সুতার! এক চামচে খেয়ে মনে হল যেন পোলাও, পায়েস, ছানার ডালনা, আলুকাবলি, বেলের মোরব্বা, দরবেশ, রাবড়ি—মানে যত ভালো ভালো খাবার জিনিস রয়েছে, সব যেন কে একসঙ্গে তার মুখে পুরে দিলে। এমন অপূর্ব, এমন আশ্চর্য অরেঞ্জ স্কোয়াশ পৃথিবীতে কেউ কখনো খায়নি!

পচামামা তখনই গিয়ে শিরিং সাহেবকে সেলাম ঠুকল। বললে, আমি রেডি।

—এক্স্পেরিমেণ্ট সাক্সেসফুল ?

—ভেরি সাক্সেসফুল !

শিরিং সাহেব খুশি হয়ে বললে, বেশ, তাহলে কালকে আমি আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, আমার ম্যানেজার, আর আমার তিনজন বন্ধু—আমরা তোমার অরেঞ্জ স্কোয়াশ খেয়ে দেখব। যদি ভালো লাগে, কালই কলকাতায় মেশিনের জন্যে অর্ডার দেব, আর তুমি হবে আমার কারখানার চীফ কেমিস্ট, মাসে দু-হাজার টাকা মাইনে।

কেল্লা ফতে! পচামামা নাচতে নাচতে চলে এল। সারা রাত ধরে স্বপ্ন দেখল সে একটা মস্ত মোটরগাড়ি চেপে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর দু-ধারের লোক তাকে সেলাম ঠুকছে।

কিন্তু বরাত কি আর অত সহজেই খোলে রে? তাহলে কি আর আজ পচামামাকে লুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরে গাঁয়ে

মুদিখানার দোকান করতে হয়? না—পেঁয়াজ আর মুসুরির ডালের ওজন নিয়ে খদ্দেরের সঙ্গে ঝগড়া করতে হয়?

যা হল, তা বলি।

পচামামা বুঝতে পেরেছিল, নিশ্চয় পিঁপড়ের ডিমের গুণেই তার তৈরি অরেঞ্জ স্কোয়াশ তখন স্বর্গের সুধা হয়ে উঠেছে। প্রাণ খুলে সে আট বোতল সুধা তৈরি করল, তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমুতে গেল। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী সুখের স্বপ্ন যে দেখল সে তো আগেই বলেছি।

পরের দিন শিরিং সাহেব তো দলবল নিয়ে পচামামার এক্সপেরিমেণ্ট চাখতে বসেছে। সবটা মিলে বেশ একটা চমৎকার মোচ্ছবের আবহাওয়া। মস্ত টেবিলে দামী টেবিল-ক্লথ পেতে দেওয়া হয়েছে, ফুলদানিতে ফুল সাজানো হয়েছে, গ্রামোফোনে নাচের রেকর্ড বাজছে, আর সাতজনের সামনে সাতটি রুপোর গ্লাস চকচক করছে।

পচামামা আহ্লাদে-আহ্লাদে মুখ করে গেলাসে গেলাসে তার এক্সপেরিমেণ্ট ঢেলে দিলে।

প্রথমে শিরিং সাহেব একটা চুমুক দিল, তারপরেই আর সবাই।

তোদের বলব কি—তক্ষুনি যেন একটা বিপর্যয় ব্যাপার ঘটে গেল। প্রথমেই 'আঁক' করে শিরিং সাহেব চেয়ারশুদ্ধ উলটে পড়ে গেল, শিরিং সাহেবের গিন্নী টেবিলে বমি করে ফেলল, তাদের ছেলে 'আঁই' করে একটা আওয়াজ তুলে সেই যে ঘর থেকে দৌড় লাগাল—পাক্কা তিন মাইল গিয়ে তারপরে বোধহয় সে থামল। ম্যানেজার হাত-পা ছুড়ে পাগলের মতো নাচতে লাগল—একজন অতিথি আর একজনকে জড়িয়ে ধরে ঘরের

মেঝেয় কুস্তি লড়তে লাগল, আর তিন নম্বর অতিথি হঠাৎ তেড়ে গিয়ে শিরিং সাহেবের কুকুরটার ল্যাজে ঘ্যাঁক্ করে কামড় দিলে।

পচামামা বুঝতে পারল, গতিক সুবিধের নয়! তার সুধা যেমনই হোক—খেয়ে এদের খুব আরাম লাগেনি। আর মনে পড়ল, শিরিং সাহেবের কুক্‌রিটাও নেহাত চালাকি নয়। কাজেই—

'থাকিতে চরণ, মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা—' পচামামা দে-দৌড়! সারাদিন দৌড়োল, তারপর সন্ধেবেলা এক গভীর বনের ভেতর একটা ভাঙা মন্দিরে বসে হাঁপাতে লাগল। ভাবল, খুব বেঁচে গেছি এ যাত্রা!

ওদিকে ঘণ্টাতিনেক বাদে মাথা-ফাথা একটু ঠাণ্ডা হলে শিরিং সায়েব হাঁক ছাড়ল: কোথায় সেই জোচ্চোর কেমিস্ট? বিষ খাইয়ে আমাদের মেরে ফেলবার জোগাড় করেছিল! শিগগির তার কান ধরে টেনে নিয়ে আয় এখানে, আমি নিজের হাতে তার মুণ্ডু কাটব!

তক্ষুনি লোক ছুটল চারদিকে।

ওদিকে পচামামা মন্দিরে বসে ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা কী হল! সে নিজে বার বার তার আবিষ্কার চেখে দেখেছে, কী তার সোয়াদ—কী তার গন্ধ! রাতারাতি অমন করে সব বদলে গেল কী করে?

হয়েছিল কী, জানিস? পচামারার বাবুর্চিটা ছিল ভীষণ লোভী। সে এক ফাঁকে একটা বোতল থেকে একটু খেয়েই এমন মজে গেছে যে চুপি-চুপি আটটা বোতলই সাফ করে ফেলেছে। তারপরেই তার খেয়াল হয়েছে, সকালে তো শিরিং সাহেব তার গর্দান নেবে! তখন করেছে কী, পচামামার এক্সপেরিমেণ্ট টেবিলে যা ছিল—মানে লেবুর রস, চাল-ধোয়া জল, টিংচার

আইডিন, এক শিশি লাল কালি, খানিক ঝোলা গুড় আর বেশ কিছু গঁদের আঠা ঢেলে আটটি বোতল আবার তৈরি করে রেখেছে। আর তাই খেয়েই—

আর পচামামা কিচ্ছুটি বুঝতে পারছে না। সমানে সেই ভাঙা মন্দিরটার ভেতরে বসে মশার কামড় খাচ্ছে, ভয়ে আর শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। ভাবছে, রাত্তিরটা কোনমতে কাটলে হয়, তারপর আবার এক দৌড়, মাইল-দশেক পেরুতে পারলেই ভুটান বর্ডার ছাড়িয়ে লঙ্কাপাড়া চা-বাগান—তখন আর তাকে কে পায় !

পচামামা যেখানে বসে আছে, তার দুপাশে ভাঙা মেঝেতে বিস্তর ফুটোফাটা। সেই ফুটো দিয়ে ধীরে ধীরে কয়েকটি প্রাণী মুখ বের করল। কালো কটকটে তাদের রঙ, লম্বা লম্বা ল্যাজের আগা বঁড়শির মতো বাঁকানো, চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। শীতের দিন, ভালো খাওয়া-দাওয়া জোটে না—পেটে বেশ খিদে ছিল তাদের। ওদিকে পচামামার কোটের পকেট থেকে কেক ডিম ভাজা— এ-সবের বেশ মনোরম গন্ধ বেরুচ্ছে। পালাবার সময় পচামামা টেবিল থেকে যা পেয়েছে দু-পকেট বোঝাই করে নিয়েছিল —বুঝেছিল পরে এসব কাজে লাগবে।

সুড়সুড় করে দু-দিকের পকেটে তারা একে একে ঢুকে পড়ল। খাবারের ধ্বংসাবশেষ কিছু ছিল, তাই খেতে লাগল একমনে। পচামামা উদাস হয়ে বসে ছিল, এসব ব্যাপার সে কিচ্ছুই টের পেল না।

হঠাৎ তার মুখের ওপর টর্চের আলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ভুটিয়া ভাষায় কে যেন বললে, এই যে, পাওয়া গেছে !

আর একজন বললে, এবার কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে চল। সকালে শিরিং সাহেব ওর মুণ্ডু কাটবে !

পচামামার রক্ত জল হয়ে গেল! সামনে দৈত্যের মতো জোয়ান দুই ভুটিয়া। কোমরে চকচকে কুক্‌রির খাপ। অন্ধকারেও পচামামা দেখল, তার মুখের ওপর টর্চ ফেলে ঝকঝকে দাঁতে হাসতে হাসতে তারা তারই দিকে এগিয়ে আসছে।

পচামামা দাঁড়িয়ে পড়ল। পালাবার পথ বন্ধ। তবু মরিয়া হয়ে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল : সাবধান—এগিয়ো না, আমার দুই পকেটেই রিভলভার আছে!

—হাঃ—হাঃ—রিভলভার!—দুই মূর্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল পচামামার ওপর। পচামামা কিছু বলবার আগেই দু-জনের দুটো ডান হাত তাকে জাপটে ধরল, আর দুটো বাঁ হাত তার দু-পকেটে রিভলভার খুঁজতে লাগল।

আর—তক্ষুনি দুই জোয়ানের গগনভেদী আর্তনাদ! পচামামাকে ছেড়ে দিয়ে তারা সোজা মেঝের ওপর গড়াতে লাগল : ওরে বাপরে, মেরে ফেলেছে রে—গেলুম—গেলুম—

ঠিক তখন বনের ভেতর দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়ল। সেই আলোয় পচামামা দেখল, দুজনের হাতেই এক এক জোড়া করে কালো কদাকার পাহাড়ী কাঁকড়াবিছে লটকে আছে, আর তার নিজের পকেটের ভেতরে সমানে আওয়াজ উঠছে খড়র-খড়র—

—উরিঃ দাদা!

পচামামা একটানে গায়ের কোটটা ছুড়ে ফেলে দিলে। তারপর ওদের পড়ে-থাকা টর্চটা কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়—দৌড়——রাম দৌড়! সকালের জন্যেও অপেক্ষা করতে হল না, একটা চিতাবাঘের পিঠের ওপর হাই জাম্প দিয়ে, একটা পাইথনের ল্যাজ মাড়িয়ে, ডজন পাঁচেক শেয়ালকে আঁতকে দিয়ে রাত নটার

সময় যখন লঙ্কাপাড়া চা বাগানে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল, তখন তার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে।

বুঝলি ক্যাবলা, এই হল আসল পাহাড়ী কাঁকড়াবিছের গল্প। ছুটো অমন বাঘা জোয়ানকে ধাঁ করে শুইয়ে দিলে। তোর কলকাতার কাঁকড়াবিছে ওদের কিছু করতে পারত? রামো—রামো!

টেনিদা থামল।

ক্যাবলা মাথা চুলকোতে লাগল। হাবুল বললে, একটা কথা জিগাইমু টেনিদা?

টেনিদা হাবুলের কথা নকল করে বললে, হ, জিগাও।

—কাঁকড়াবিছায় কেক-বিস্কুট-ডিমভাজা খায়?

—এ তো আর তোর কলকাত্তিয়া নয়, পাহাড়ী কাঁকড়াবিছে। ওদের মেজাজই আলাদা। আমার কথা বিশ্বাস না হয় পচামামাকে জিজ্ঞেস কর্।

—তেনারে পামু কই?

টেনিদা বললে, ধ্যাধ্যেড়ে কালীকেষ্টপুরে।

আমি জানতে চাইলুম: সে কোথায়?

টেনিদা বললে খুব সোজা রাস্তা। প্রথমে আমতা চলে যাবি। সেখান থেকে দশ মাইল দামোদরে সাঁতার কাটবি। তারপর ডাঙায় উঠে চল্লিশ মাইল পঁচাত্তর গজ সাড়ে এগারো ইঞ্চি হাঁটলেই ধ্যাধ্যেড়ে কালীকেষ্টপুরে পৌঁছে যাবি। আচ্ছা, তোরা তাহলে সেখানে রওনা হয়ে যা, আমি এখন একবার পিসিমার বাড়িতে চললুম। টা-টা—

বলেই হাত নেড়ে লাফিয়ে পড়ল রক থেকে, ধাঁ করে হাওয়া হয়ে গেল।

সাঙ্ঘাতিক!

সাতদিন পরেই পরীক্ষা। আর কী? সেই কালান্তক স্কুল-ফাইন্যাল।

পর-পর দুবার সাদা কালিতে আমার নাম ছাপা হয়েছে। তিন বারের পরও যদি তাই ঘটে—তাহলে বড়দা শাসিয়েছে আমাকে সোদপুরে রেখে আসবে।

—সোদপুরে তো গান্ধীজী এসে থাকতেন। আমি গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম।

—তুমি থাকবে। বড়দা আরো গম্ভীর হয়ে বললে, তবে গান্ধীজী যেখানে থাকতেন সেখানে নয়। তিনি যাদের দুধ খেতেন তাদের আস্তানায়।

—মানে?

—মানে পিঁজরাপোলে।

আমি ব্যাজার হয়ে বললাম, পিঁজরাপোলে কেন থাকতে যাব? ওখানে কি মানুষ থাকে?

—মানুষ থাকে না গরু-ছাগল তো থাকে। সেইজন্যেই তো তুই থাকবি, কচি-কচি ঘাস খাবি আর ব্যা-ব্যা করে ডাকবি।

শুনে মনটা এত খারাপ হল যে কী বলব! একদিন সন্ধে-বেলা গড়ের মাঠে গিয়ে চুপি চুপি একমুঠো কাঁচা ঘাস খেয়ে দেখলাম—যাচ্ছেতাই লাগল। ছাদে গিয়ে একা-একা ব্যা-ব্যা করেও ডাকলাম, কিন্তু ছাগলের মতো সেই মিঠে প্রাণ-কাড়া আওয়াজটা কিছুতেই বেরুল না।

তাই ভারি দুশ্চিন্তায় পড়লাম। গিয়ে বললাম লীডার টেনিদাকে।

টেনিদার অবস্থা আমার মতোই। এবার নিয়ে ওর চারবার হবে। হাবুল সেনের দ্বিতীয় বার। শুধু হতভাগা ক্যাবলাটাই লাফে লাফে ফার্স্ট হয়ে এগিয়ে আসছে—তিন ক্লাশ নিচে ছিল, ঠিক ধরে ফেলেছে আমাকে। এর পরে যদি টপকে চলে যায়—তাহলে সত্যিই পিঁজরাপোলে যেতে হবে।

চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে টেনিদা আতা খাচ্ছিল। গভীর-ভাবে চিন্তা করতে গিয়ে গোটাকয়েক বিচি খেয়ে ফেলল। তারপর অন্যমনস্কভাবে, খোসাটা যখন অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে, তখন সেটাকে থু—থু করে ফেলে দিয়ে বললে, ইউরেকা! হয়েছে!

—কী হয়েছে?

—প্ল্যানচেট।

—প্ল্যানচেট কাকে বলে?

টেনিদা বললে, তুই একটা গাধা! প্ল্যানচেট করে ভূত নামায়—জানিসনে?

এর মধ্যেই কোত্থেকে পাঁটার ঘুগনি চাটতে চাটতে ক্যাবলা এসে পড়েছে। বলল, উঁহু, ভুল হল। ওর উচ্চারণ হবে প্লাঁসেৎ।

—থাম্-থাম্—বেশি ওস্তাদি করিস নি! ভূতের আবার শুদ্ধ উচ্চারণ! তারা তো চন্দ্রবিন্দু ছাড়া কথাই কইতে পারে না—বলেই ছোঁ মেরে ক্যাবলার হাত থেকে ঘুগনির পাতাটা কেড়ে নিলে টেনিদা।

ক্যাবলা হায়-হায় করে উঠল। টেনিদা একটা বাঘাটে

হুঙ্কার করে বললে, থাম্, চিল্লাসনি! এ হল তোর ধৃষ্টতার শাস্তি! বলতে বলতে জিভের এক টানে ঘুগনির পাতা একদম সাফ।

ভেবেছিলাম আমাকেও একটু দেবে—কিন্তু পাতার দিকে তাকিয়ে বুকভরা আশা একেবারে ধুক করে নিবে গেল। বললাম, মরুকগে প্ল্যানচেট আর প্লাঁসেৎ—কিন্তু ওসব ভুতুড়ে কাণ্ড আবার কেন? ভূত-টুত আমার একেবারেই পছন্দ হয় না!

টেনিদা হেঁ-হেঁ করে বললে, আছে রে গোমুখ্যু, আছে! সবাই কি আর তালগাছের মতো হাত বাড়িয়ে ঘাড় মটকে দেয়? ওদের মধ্যেও দু-চারটে ভদ্দর লোক আছে। তারা পরীক্ষার কোশ্চেন-টোশ্চেন বলে দেয়।

—অ্যাঁ?

—তবে আর বলছি কী! টেনিদা এবার শালপাতার উলটো দিকটা একবার চেটে দেখল। কিছু পেলে না—তালগোল পাকিয়ে ক্যাবলার মুখের ওপর পাতাটা ছুড়ে দিলে। বললে, আমার বিরিঞ্চিমামা কিছুতেই আর বি. এ. পাশ করতে পারে না। গুণে গুণে আঠারো বার গাড্ডা খেল। শেষকালে যখন আমার মামাতো ভাই গুবরে বি. এ. ক্লাসে উঠল, তখন বিরিঞ্চিমামার আর সইল না। প্ল্যানচেটে বসল। আর বললে পেত্যয় যাবি না প্যালা—টপ্ টপ্ করে কোশ্চেন-পেপার এসে পড়তে লাগল টেবিলের ওপর।

—পরীক্ষার পরে না আগে? রোমাঞ্চিত হয়ে আমি জানতে চাইলাম।

—দূর উল্লুক! পরে হবে কেন রে, একমাস আগে।

হঠাৎ ক্যাবলা একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসল:

—আচ্ছা টেনিদা—সবশুদ্ধ তোমার কটা মামা ?

—অত খবরে তোর দরকার কী রে গর্দভ? পুলিশ কমিশনার থেকে পকেটমার পর্যন্ত সারা বাংলা দেশে আমার যত মামা, তাদের লিস্‌টি করতে গেলে একটা গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকা হয়ে যায়—তা জানিস ?

—ছাড়ান দ্যাও—ছাড়ান দ্যাও ! বললে হাবুল সেন।

আমি বললাম, আমাদের অঙ্কের কোশ্চেন যে করেছে সে কি তোমার মামা হয় নাকি ?

—কে জানে, হতেও পারে ! টেনিদা তাচ্ছিল্য করে জবাব দিলে।

—তাহলে তাকেই প্ল্যানচেটে ডাকো না !

—চুপ কর্ বেল্লিক ! জ্যান্ত মানুষ কি কখনো প্ল্যানচেটে আসে ? ভূতকে ডাকতে হয়। ভূতের অসীম ক্ষমতা—যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। তেমন-তেমন ভূত যদি আসে—ব্যাস—মার দিয়া কেল্লা !

—বেশ তো—আনো না তবে ভূতকে ! আমি অনুনয় করলাম।

—বললেই হল ? টেনিদা প্রায় ভূতের মতো দাঁত খিচোল ঃ ভূত কি চানাচুরওলা যে ডাকলেই আসবে ? তার জন্যে হ্যাপা আছে না ? অন্ধকার ঘর চাই—টেবিল চাই—চারজন লোক চাই—

ক্যাবলার চোখদুটো মিট-মিট করছিল। বললে, ঠিক আছে। আমাদের গ্যারেজের পাশে একটা অন্ধকার ঘর আছে—একটা পা-ভাঙা টেবিল আমি দেব, আর চারমূর্তি আমরা তো আছিই।

টেনিদা বললে, বাঃ, গ্র্যাণ্ডি! শুনে এত ভালো লাগছে যে তোর পিঠে আমার তিনটে চাঁটি মারতে ইচ্ছে করছে!

ক্যাবলা একলাফে রোয়াক থেকে নেমে পড়ল। বললে, তাহলে আজ রাত্রেই?

টেনিদা বললে, হ্যাঁ—আজ রাত্রেই।

আমার কেমন যেন সুবিধে মনে হচ্ছিল না। ভূত-টুত কেমন যেন গোলমেলে ব্যাপার! কিন্তু সাতদিন পরেই যে স্কুল ফাইন্যাল! আর তার দেড়মাস বাদেই পিঁজরাপোল!

অগত্যা নাক-টাক চুলকে আমায় রাজি হয়ে যেতে হল।

বাড়ির পেছনে গ্যারাজ—এমনি ঘুরঘুট্টি অন্ধকার সেখানে! গ্যারাজের পাশের ছোট টিনের ঘরটা যেন ভুষো কালি মাখানো। গিয়ে দেখি ক্যাবলা সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে। একটা পায়া-ভাঙা টেবিল। তার চারদিকে চারটে চেয়ার। একটু দূরে লম্বা দড়ির সঙ্গে ছোট একটা বস্তা ঝুলছে। টেবিলের ওপর ক্যাবলা একটা মোমবাতি জেলে রেখেছিল—তার আলোতেই সব দেখতে পেলাম।

বস্তাটা দেখিয়ে হাবুল বললে, ওইটা কী ঝুল্যা আছে রে! খাওন-দাওনের কিছু আছে নাকি?

টেনিদা বললে, পেট-সর্বস্ব সব—খালি খাওয়াই চিনেছে! ওটা বক্সিংয়ের বালির বস্তা।

—ভূত আইস্যা ওইটা লইয়া বক্সিং কোরবো নাকি? হাবুলের জিজ্ঞাসা।

টেনিদা বললে, থাম্—এখন বেশি বাজে বকিসনি! এবার কাজ শুরু করা যাক। হ্যাঁরে ক্যাবলা—এদিকে কেউ এখন আসবে না তো?

—না, সে ভয় নেই।

—তবে দরজা বন্ধ করে দে।

ক্যাবলা দরজা বন্ধ করে দিলে। টেনিদা বললে, চারজনে চারটে চেয়ারে বসব আমরা। আলো নিবিয়ে দেব। তারপরে ধ্যান করতে থাকব।

—ধ্যান? কিসের ধ্যান?—আমি জানতে চাইলাম।

—ভূতের। মানে অঙ্কের কোশ্চেন বলে দিতে পারে—এমন ভূতের।

হাবুল বললে, সেইডা মন্দ কথা না। হারু পণ্ডিতেরে ডাকন যাউক!

হারু পণ্ডিত! শুনে আমার বুকের ভেতরে একেবারে ছ্যাঁৎ করে উঠল। তিন বছর আগে মারা গেছেন হারু পণ্ডিত। দুর্দান্ত অঙ্ক জানতেন। তার চাইতেও জানতেন দুর্দান্তভাবে পিটতে। একটা চৌবাচ্চার নল দিয়ে জল-টল ঢোকার কি সব অঙ্ক দিতেন; আমরা হাঁ করে থাকতাম আর পটাৎ পটাৎ গাঁট্টা খেতাম। সেই হারু পণ্ডিতকে ডাকা!

আমি বললাম, বড্ড মারত যে!

—এখন আর মারবে না। ভূত হয়ে মোলায়েম হয়ে গেছে। তা ছাড়া কেউ তো ডাকে না—আমরা ডাকলে কত খুশি হবে দেখিস। শুধু অঙ্ক কেন—চাই কি আদর করে সব কোশ্চেনই বলে দেবে! টেনিদা আমাকে উৎসাহিত করলে।

ক্যাবলা বললে, তবে ধ্যানে বসা যাক।

আমি বললাম, হাঁ ভাই, একটু তাড়াতাড়ি! বেশি দেরি হয়ে গেলে বড়দা কান পেঁচিয়ে দেবে। আমি বলে এসেছি—ক্যাবলার কাছে অঙ্ক কষতে যাচ্ছি।

টেনিদা বললে, আমি আলো নিবিয়ে দিচ্ছি। তার আগে শেষ কথাগুলো বলে নিই। সবাই হারু পণ্ডিতকে ধ্যান করবি এক মনে এক প্রাণে। সেই দাড়ি—সেই ডাঁট-ভাঙা চশমা, সেই—টাক—সেই নস্যি নেওয়া—

ক্যাবলা বললে, সেই গাঁট্টা।

টেনিদা ধমক দিয়ে বললে, চুপ্, বাজে কথা এখন বন্ধ। শুধু ধ্যান। এক মনে এক প্রাণে। শুধু প্রার্থনা: স্যার—দয়া করে একবার আসুন—আপনার অধম ছাত্রদের পরীক্ষার কোশ্চেন-গুলো বলে দিয়ে যান! আর কিছু না—আর কোন কথা নয়। আচ্ছা আমি আলো নেবাচ্ছি। ওয়ান—টু—থ্রী—

টুক্ করে আলো নিবে গেল।

বাপ্স্ কী, অন্ধকার! যেন দম আটকে যায়! ভয়ে আমার গা শির্-শির্ করতে লাগল, ধ্যান করব কী ছাই!

তবু ধ্যানের চেষ্টা করা যাক। কিন্তু কী যাচ্ছেতাই মশা এ ঘরে! পা দুটো একেবারে ফুটো করে দিচ্ছে! অনেকক্ষণ দাঁত-টাঁত খিঁচিয়ে থেকে আর পারা গেল না। চটাস্ করে একটা চাঁটি মারলাম।

কিন্তু একি! পায়ে চাঁটি মারলাম—কিন্তু লাগল না তো? আমার পা কি একেবারে অসাড় হয়ে গেছে? আর আমার পাশ থেকে হাবুল তখনই হাঁইমাই করে চেঁচিয়ে উঠল: অ টেনিদা, ভূতে আমার পায়ে ঠাঁই কইর‍্যা একটা চোপাড় মারছে!

টেনিদা বললে, শাট্ আপ! ধ্যান করে যা।

—কিন্তু আমারে যে চোপাড় মারল!

—ধ্যান না করলে আরো মারবে। চোখ বুজে বসে থাক্।

আমি একদম চুপ। এঃ হে-হে—ভারি ভুল হয়ে গেছে! অন্ধকারে নিজের ঠ্যাং ভেবে হাবুলের পায়েই চড় মেরে দিয়েছি।

আরো কিছুক্ষণ কাটল। ধ্যান করবার চেষ্টা করছি—কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হারু পণ্ডিতের টাক আর দাড়িটা বেশ ভাবতে পারছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গাঁট্টাটাও বিচ্ছিরিভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে। তক্ষুনি ধ্যান বন্ধ করে দিচ্ছি। ওদিকে আবার দারুণ ক্ষিদে পাচ্ছে। আসবার সময় দেখেছি—রান্নাঘরে মাংস চেপেছে। এতক্ষণে হয়েও গেছে বোধহয়। বাড়িতে থাকলে ঠাকুরের কাছে গিয়ে এক-আধটু চাখতে-টাখতেও পারতাম। যতই ভাবি, খিদেটা ততই যেন নাড়ির ভেতর পাক খেতে থাকে।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে রব উঠল ঃ ব্যা-ব্যা-ব্যা—অ্যা-অ্যা—

কী সর্বনাশ! ধ্যান করতে করতে শেষকালে পাঁটার আত্মা ডেকে আনলাম নাকি! এতক্ষণ যে মাংসের কথাই ভাবছিলাম!

আমার পাশ থেকে হাবুল কাঁপা গলায় বললে, অ টেনিদা—পাঠা ভূত!

অন্ধকারে টেনিদা গর্জন করলে ঃ যেমন তোরা পাঁটা—পাঁটা-ভূত ছাড়া আর কী আসবে তোদের কাছে!

ক্যাবলা খিক-খিক করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার শোনা গেল ঃ ভ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা—

টেনিদা বললে, অমন কত আসবে! ধ্যানে বসলে সবাই আসতে চায় কিনা! এখন কেবল একমনে জপ করে যা—পাঁটা-ভূত, তুমি চলে যাও, স্বর্গে গিয়ে ঘাস খাও। আমরা

শুধু হারু পণ্ডিতকে চাই। সেই টাক, সেই দাড়ি—সেই নস্যির ডিবে—আমাদের সেই স্যারকেই চাই। আর কাউকে না—কাউকেই না—

পাঁটা ভূতকে আমি যে ডেকে ফেলেছি সেটা চেপে গেলাম। কিন্তু আমার পায়ে ওটা কী সুড়সুড়ি দিয়ে গেল? প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছি—হঠাৎ টের পেলাম—আরসোলা।

খিদেটা ভুলে গিয়ে প্রাণপণে স্যারকে ডাকতে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ ধ্যানের জো আছে? ঘচাং করে কে যেন আমার পায়ে ল্যাং মারল।

—টেনিদা, ভূতে ল্যাং মারছে আমাকে—আমি আর্তনাদ করলাম।

হাবুল বলে উঠল: আঃ—খামাখা গাধার মতন চ্যাচাস ক্যান? আমার পা-টা হঠাৎ লাইগ্যা গেছে!

টেনিদা দাঁত কিড়মিড় করে উঠল: উঃ—এই গাড়োল-গুলোকে নিয়ে কি ধ্যান হয়? তখন থেকে সমানে ডিস্‌টার্ব করছে! এবার যে একটা কথা বলবে, তার কান ধরে সোজা বাইরে ফেলে দেব!

আবার ধ্যান শুরু হল।

প্রায় হারু পণ্ডিতকে ধ্যানের মধ্যে এনে ফেলেছি। এলো, এলো—এসেই পড়েছে বলতে গেলে! টাকটা প্রায় আমার চোখের সামনে—মনে হচ্ছে যেন দাড়ির সুড়সুড়ি আমার মুখে এসে লাগছে। এক মনে বলছি: দোহাই স্যার, স্কুল ফাইন্যাল স্যার—অঙ্কের কোশ্চেন স্যার!—আর ঠিক তক্ষুনি—

কেমন একটা বিটকেল শব্দ হল মাথার ওপর।

চমকে তাকাতে দেখি, টিনের চালের গায়ে দুটো জ্বলজ্বলে

চোখ। ঠিক যেন মোটা-মোটা চশমার আড়াল থেকে হারু পণ্ডিত আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। আমার পালাজ্বরের পিলেটা সঙ্গে সঙ্গে তড়াং করে লাফিয়ে উঠল !

—ও কী—ও কী টেনিদা !—আমি আবার আর্তনাদ করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্বলন্ত চোখদুটো যেন শূন্য থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—আর আমার মাথায় এসে লাগল এক রাম-চাঁটি ! ভূত হয়ে সে চাঁটি মোলায়েম হওয়া তো দূরে থাক—আরো মোক্ষম হয়ে উঠেছে।

—বাপ্‌রে গেছি—বলে আমি প্রচণ্ড এক লাফ মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে টেবিল উলটে পড়ল।

—খাইছে—খাইছে—ভূতে খাইছে রে—হাবুল কেঁদে উঠল।

—টেবিল চাপা দিয়ে আমায় মেরে ফেলে দিলে রে—টেনিদার চিৎকার শোনা গেল।

অন্ধকারে আমি দরজার দিকে ছুটে পালাতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন আমার ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়ল। আমার গলা দিয়ে 'গ্যাঁ—ঘোঁক্'—বলে একটা আওয়াজ বেরুলো—আর তার পরেই—সর্ষে ফুল! ঝিঁঝির ডাক! পটলডাঙার প্যালারাম একেবারে ঠায় অজ্ঞান।

চোখ মেলে দেখি, মেঝেয় পড়ে আছি। ঘরে মোমবাতি জ্বলছে, আর ক্যাবলা আমার মাথায় জল দিচ্ছে। চেয়ার টেবিলগুলো ছত্রাকার হয়ে আছে ঘরময়।

আমি বললাম, ভূ—ভূ—ভূত !

ক্যাবলা বললে, না—ভূত নয়। টেনিদা আর হাবুল তক্ষুনি পালিয়েছে বটে, কিন্তু তোকে চুপি চুপি সত্যি কথা বলি। ঘরটার পেছনেই একটা ছাগল বাঁধা আছে। দাদুর

হাঁপানির রোগ আছে কিনা, ছাগলের দুধ খায়। সেই ছাগলটাই ডাকছিল।

—আর সেই জ্বলজ্বলে চোখ? সেই চাঁটি?

—হুলোর।

—হুলো কে?

—আমাদের বেড়াল। এ ঘরে প্রায়ই ইঁদুর ধরতে আসে।

—কিন্তু হুলো কি অমন চাঁটি মারতে পারে?

—চাঁটি মারবে কেন রে বোকা? তুই চ্যাচালি—ভয় পেয়ে হুলোও চাল থেকে লাফ দিলে। পড়বি তো পড় ছোড়দার স্যাণ্ড-ব্যাগের ওপরে। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগটা দোল খেয়ে এসে তোর মাথায় লাগল—তুই ভাবলি হারু পণ্ডিতের গাঁট্টা—ক্যাবলা হেসে উঠল।

—আর আমার ঘাড়ে অমন করে লাফিয়ে পড়ল কে?

—হাবলা। ভয় পেয়ে বেরুতে গিয়ে তোকে বিধ্বস্ত করে চলে গেছে।—ক্যাবলা হেসে উঠল আবার।

আমি আবার চোখ বুজোলাম। ক্যাবলার কথাই হয়ত ঠিক। কিন্তু আমার মন বলছে—ওই হুলো আর বালির বস্তার মধ্য দিয়ে সত্যি-সত্যিই হারু পণ্ডিতের মোক্ষম চাঁটি আমার মাথায় এসে লেগেছে।

কারণ, পৃথিবীতে অমন দুর্মদ চাঁটি আর কেউ হাঁকড়াতে পারে না। আর কিছুতেই না।

চাটুজ্জেদের রকে বসে আমি একটা পাকা আমকে কায়দা করতে চেষ্টা করছিলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ খেতে হল না। গোটা-চারেক কামড় দিয়েই ফেলে দিতে হল—অ্যায়সা টক! দাঁতগুলো শির্‌-শির্‌ করতে লাগল—মেজাজটা বেজায় খিচড়ে গেল আমার। বাড়িতে মাংস এসেছে দেখেছি—রাত্তিরে জুত করে হাড় চিবুতে পারব কি না কে জানে!

এই সময় কোত্থেকে পটলডাঙার টেনিদা এসে হাজির। গাঁক-গাঁক করে বললে, এই প্যালা, আমটা ফেলে দিলি যে?

—যাচ্ছেতাই টক! খাওয়া যায় নাকি?

—টক? টেনিদা ধুপ্‌ করে আমার পাশে বসে পড়ে বললে, টক বলে বুঝি গেরাহ্যি হল না? সংসারে টক যদি না থাকত, তাহলে আচার পেতিস কোথায়? টক যদি না থাকত তাহলে কী করে দই জমত? টক যদি না থাকত তাহলে চালকুমড়োর সঙ্গে কামরাঙার তফাত কী থাকত? টক যদি না থাকত তাহলে পিঁপড়েরা কী করে টক-টক হত? টক না থাকলে—

টক না থাকলে পৃথিবীতে আরো অনেক অঘটন ঘটত—কিন্তু সে-সবের লম্বা লিস্টি শোনবার মতো উৎসাহ আমার ছিল না। আমি বাধা দিয়ে বললুম, তাই বলে অত টক আম কোন ভদ্দরলোক খেতে পারে নাকি?

আমের গন্ধে কোত্থেকে একটা মস্ত নীল রঙের কাঁঠালে-

মাছি এসেছে, সেটা শেষতক টেনিদার খাঁড়ার মতো মস্ত নাকটার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল। আমার কথা শুনে টেনিদার সেই পেল্লায় নাকের ভেতর থেকে রণ-ডম্বরুর মতো একটা বিদঘুটে আওয়াজ বেরুলো। মাছিটা শূন্যে বার-দুই ঘুরপাক খেয়ে বোঁ করে মাটিতে পড়ে গেল—ভির্মি খেল না হার্টফেলই করল কে জানে ?

টেনিদা বললে, ইস্-স্-স্! খুব যে ভদ্দর লোক হয়ে গেছিস দেখছি! তবু যদি পালা জ্বরে ভুগে দু-বেলা পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল না খেতিস! তুই কি আমার গাবলুমামার চাইতেও ভদ্দরলোক ? জানিস, গাবলুমামা এখনো চারশো টাকা মাইনে পায় ?

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, জেনে আমার লাভ কী ? তোমার গাবলুমামা তো আমায় টাকা ধার দিতে যাচ্ছে না ?

—তোর মতো অখাদ্যিকে টাকা ধার দিতে বয়ে গেছে গাবলুমামার! টেনিদার নাক দিয়ে আবার একটা আওয়াজ বেরুলো ঃ জানিস—তিনবার-আই. এ.-ফেল-করা গাবলু মামা অতো বড় চাকরিটা পেলো কী করে? স্রেফ টক আমের জন্যে।

—টক আমের জন্যে ? আমি হাঁ করে রইলুম ঃ টক আম খেলে বুঝি ওইরকম চাকরি হয় ?

—খেলে নয় রে গাধা—খাওয়ালে। তবে, তাক বুঝে খাওয়াতে জানা চাই। বলছি তোকে ব্যাপারটা—অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবি। তার আগে গলির মোড় থেকে দু-আনার ডালমুট নিয়ে আয়।

জ্ঞানলাভ করতে চাই আর না চাই, টেনিদা যখন একবার

ডালমুট খেতে চেয়েছে—তখন খাবেই। পকেটে পয়সা থাকলেই ও ঠিক টের পায়। কী করি, আনতেই হল ডালমুট।

—তুই পেটরোগা, এসব তোর খেতে নেই—বলে হ্যাঁচকা টানে টেনিদা ঠোঙাটা কেড়ে নিলে। আমি ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। খেতে যখন দেবে না, তখন বেশ করে নজর দিয়ে দিই। পরে টের পাবে।

টেনিদা ভ্রূক্ষেপ করলে না। বললে, তবে শোন্। আমার মামার বাড়ি কোথায় জানিস তো? খড়্গপুরে। সেই যে খড়্গপুর—যেখানে রেলের অনেক ইঞ্জিন-টিঞ্জিন আছে?

সেবার গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি বেড়াতে গেছি। ওই যে একটা ছড়া আছে না—'মামাবাড়ি ভারি মজা—কিল চড় নাই'? কথাটা একদম বোগাস—বুঝলি? কক্ষনো বিশ্বাস করিসনি!

অবিশ্যি মামাবাড়িতে ভালো লোক একেবারে নেই তা নয়। দিদিমা—দাদু এরা বেশ খাসা লোক। বড়মামীরাও মন্দ হয় না। কিন্তু ওই গাবলুমামা-টামা, বুঝলি, ওরা ভীষণ ডেঞ্জারাস হয়!

বললে বিশ্বাস করবি নে, সাতদিনের মধ্যে গাবলুমামা দুবার আমার কান টেনে দিলে। এমন কিছু করিনি, কেবল একদিন ওর ঘড়িটায় একটু চাবি দিয়েছিলুম—তাতে নাকি স্প্রিংটা কেটে গিয়েছিল। আর-একদিন ওর শাদা নাগরাটা কালো কালি দিয়ে একটু পালিশ করেছিলুম, আর নেটের মশারিতে কাঁচি দিয়ে একটা গ্র্যাণ্ড জানলা বানিয়ে দিয়েছিলুম। এর জন্যে দুদিন আমার কান ধরে পাক দিয়ে দিলে। কী ভীষণ ছোটলোক বল্ দিকি!

তা, পড়ে মরুক গাবলুমামা—খড়্গপুরে দিনগুলো আমার

ভালোই কাটছিল। দিব্যি খাওয়া-দাওয়া—মজাসে ইস্টিশানে রেল দেখে বেড়ানো, হাঁটতে হাঁটতে একেবারে কাঁসাইয়ের পুল পর্যন্ত চলে যাওয়া, সেখানে বেশ চড়ুইভাতি—আরো কত কী! বেশ ছিলুম।

বেশ মনের মতো বন্ধুও জুটে গিয়েছিল একটি। তার ডাক-নাম ঘটা—ভালো নাম ঘটকর্পর। ওর ছোট ভাইয়ের নাম ক্ষপণক, ওর দাদার নাম বরাহ। ওদের বাবা গোবর্ধনবাবুর ইচ্ছে ছিল,—ওদের ন-ভাইকে নিয়ে নবরত্ন-সভা বসাবেন বাড়িতে।

কিন্তু ক্ষপণকের পর আর ভাই জন্মালো না—খালি বোন আর বোন। রেগে গিয়ে গোবর্ধনবাবু তাদের নাম দিতে লাগলেন, জ্বালামুখী, মুণ্ডমালিনী এই সব। এমনকি খনা নাম পর্যন্ত রাখলেন না কারুর।

তা এই তিন রত্নেই যথেষ্ট—একেবারে তিন তিরিখ্খে নয়! এক একটা বিচ্ছু অবতার! আর ঘটা তো একেবারে সাক্ষাৎ শয়তানির ঘট!

আগে কি আর বুঝতে পেরেছিলুম? তাহলে ঘটার ত্রিসীমানায় কে যায়! ওর ঠাকুরমার ভাঁড়ার থেকে আচার-টাচার চুরি করে এনে আমায় খাওয়াতো—আমি ভাবতুম অমন ভালো ছেলে বুঝি ছুনিয়ায় আর হয় না!

কিন্তু শেষকালে এই ঘটাই আমাকে এমন একখানা লেঙ্গি মেরে দিলে যে কী বলব!

একদিন ছুপুরবেলা গাবলুমামা বেশ প্রেম্‌সে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, আর আমি দরজার ফাঁক দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারছি। একটা ছিপ চাঁছব—গাবলুমামার দাড়ি-কামানোর চকচকে ক্ষুরটা হাত-সাফাই করতে পারলে ভীষণ সুবিধে হয়।

এমন সময় ফিস্-ফিস্ করে ঘটা আমার কানে কানে বললে, এই টেনি, আম খাবি ?

কেন খাব না—খেতে আর ভয় কী ! আর আমায় জানিস তো প্যালা—খাওয়ার ব্যাপারে কাপুরুষতা আমার একদম বরদাস্ত হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তুহাত তুলে লাফিয়ে উঠে আমি বললুম, কোথায় রে ?

—আমাদের বাগানে।

আমি বললুম, ওরে বাবা !

বলবার কারণ ছিল। গোবর্ধনবাবুর খুব ভালো একটা আমের বাগান আছে—বাছাই বাছাই কলমের আম। ল্যাংড়া, বোম্বাই, মিছরিভোগ—আরো কত কী। দেড় মাইল দূর থেকেও আমের গন্ধে জিভে জল আসে। কিন্তু কাছে যায় সাধ্যি কার ! যমদূতের মতো একটা অ্যায়সা জোয়ান মালী রাতদিন খাড়া পাহারা দিচ্ছে সেখানে। একটু উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছ কি সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় হাঁক পাড়বে, ইখানে হৈচ্ছে কী ? ও-সব চলিবেনি ! না পালাইছ তো পিট্টি খাইছ !

ঘটা বললে, কিছু ঘাবড়াসনি—বুঝলি ? আজ জামাইষষ্ঠী কিনা—মালী এবেলা শ্বশুরবাড়ি গেছে। ভালোমন্দ খেয়ে-দেয়ে সন্ধের পর ফিরবে। আজকেই সুযোগ !

অমন জাঁদরেল মালীরও শ্বশুরবাড়ি থাকে—আমার বিশ্বাসই হল না। ঘটা বললে, সত্যি বলছি টেনি ! চল্ না বাগানে—গেলেই বুঝতে পারবি।

গেলুম বাগানে। বেগতিক দেখলেই রামদৌড় লাগাবো। লম্বা লম্বা ঠ্যাং-তুটো তো আছেই।

গিয়ে দেখি, সত্যিই তাই। মালীর ঘরে মস্ত একটা তালা ঝুলছে। আর বাগানে?

গাছভর্তি আম আর আম! তাদের কী রঙ, আর ক্যায়সা খোশবু! মনে হল যেন স্বর্গের নন্দনবনে এসে ঢুকেছি আর চারিদিকে অমৃত ফল ঝুলছে! কিন্তু হলে কী হবে! প্রায় সবগুলো গাছই বিচ্ছিরি-রকমের জাল দিয়ে ঘেরাও করা। ঢিল মারলে পড়বে না—আঁকশিতে নামবে না।

শুধু একদিকে বেঁটে চেহারার একটা গাছে কোন জালই নেই। আর, কী আম হয়েছে সে গাছে! মাটির হাতখানেক কাছাকাছি পর্যন্ত আম ঝুলে পড়েছে। পেকে টুকটুক করছে আমগুলো—লালে আর হলদেতে কী আশ্চর্য তাদের রঙ! দেখেই আনন্দে আমার মূর্ছা যাওয়ার জো হল।

ঘটা বললে, এ আমের নাম হল পেশোয়ার কী আমীর। আমের সেরা! খেলে মনে হবে পেশোয়ারের আঙুর, ভীম নাগের সন্দেশ আর কাশীর চমচম একসঙ্গে খাচ্ছিস। লেগে যা টেনি—

বলবার আগেই লেগে গেছি আমি। চক্ষের নিমেষে টেনে নামিয়েছি গোটা-পনেরো পেশোয়ার কী আমীর। তারপর বেশ টুস্‌টুসে একটা আমে যেই কামড় বসিয়েছি—

সঙ্গে সঙ্গে কী যে হল সে আমার মনে নেই প্যালা! আমি মাথা ঘুরে সেইখানেই বসে পড়লুম। ওরে ব্বাপ্‌স্‌—কী টক! দশ মিনিট ধরে খালি মনে হতে লাগল, আমার দুপাটি দাঁতের ওপর কেউ দমাদম হাতুড়ি ঠুকছে—আমার দুকানে তিরিশটা ঝিঁঝি পোকা কোরাস গাইছে, আমার নাকের ওপর তিন ডজন উচ্চিংড়ে লাফাচ্ছে, আমার মাথার ওপর সাতটা কাঠঠোকরা এক নাগাড়ে ঠুকে চলেছে!

যখন জ্ঞান হল—তখন দেখি দু-ডজন পেশোয়ার কী আমীর সামনে নিয়ে আমি বসে আছি ধুলোর ওপর। ঘটার চিহ্নমাত্র নেই। ঘটকর্পর কর্পূরের মতোই উবে গেছে।

কী শয়তান, কী বিশ্বাসঘাতক! একবার যদি ওকে সামনে পাই, তাহলে ওর নাক খিমচে দেব, কান কামড়ে দেব, পিঠে জলবিছুটি ঘষে দেব, ওর ছুটির টাস্কের সব অঙ্কগুলো এমন ভুল করে রেখে দেব যে ইস্কুলে গেলেই সপাসপ বেত। কিন্তু সে পরের কথা পরে। এখন কী করি!

আমের লোভেই কি না কে জানে, পাটকিলে রঙের মস্ত দাড়িওলা একটা রামছাগল গুটি-গুটি পায়ে আমার দিকে এগোচ্ছে। আমার সমস্ত রাগ ছাগলটার ওপরে গিয়ে পড়ল। বটে—আম খাবে! দ্যাখো একবার পেশোয়ার কী আমীরকে পরখ করে!

ছাগলে সব খায়—জানিস তো প্যালা? ছাতা খায়, খাতা খায়, হকিস্টিক খায়, জুতো খায়—জুতোবুরুশওয়ালাকেও যে বাগে পেলে খায় না একথা জোর করে বলা যায় না। আমার সেই কামড়-দেওয়া আমটাকেই দিলুম ছুড়ে ওর দিকে।

মাটিতেও পড়তে পেলো না—ক্রিকেট বলেই মতোই আকাশে লাফিয়ে উঠে ছাগলটা আমটাকে লুফে নিলে। তারপর?

—ব্যা—আ-আ—করে গগনভেদী আওয়াজ হল একটা। একটা নয়—যেন সমস্ত ছাগল জাতি একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল। তারপরেই টেনে একখানা দৌড় মারল। সে কী দৌড় রে প্যালা! চক্ষের পলকে বাগান পেরুলো, মাঠ পেরুলো, লাফ মারতে মারতে খানা খন্দল পেরুলো। বোধহয় মেদিনীপুরে গিয়েই শেষ-তক সেটা থামল।

আমি জ্বলন্ত চোখে আমগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলুম। ঘটাকে একটা খাওয়াতে পারলে বুকের জ্বালা নিভত! কিন্তু সেটাকে আর পাই কোথায়? তিন দিনের মধ্যেও তার টিকির ডগাটি পর্যন্ত দেখতে পাব না এটা নিশ্চিত।

তাহলে কাকে খাওয়াই?

নির্ঘাৎ গাবলুমামাকে। দুদিন আমার কানদুটো বেহালার কানের মতো আচ্ছা করে মুচড়ে দিয়েছে। এ আম গাবলুমামারই খাওয়া দরকার।

গোটা-আষ্টেক আম কোঁচড়ে লুকিয়ে ফিরে এলুম।

ভগবান ভরসা থাকলে সবই সম্ভব হয় প্যালা—বুঝলি? বাড়ি ফিরে দেখি ভীষণ হৈ-চৈ! গাবলুমামা কোন্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে চাকরির চেষ্টায়। দইয়ের ফোঁটা-টোঁটা পরানো হচ্ছে—দিদিমা—বড়মামী—দাদু—সবাই একসঙ্গে দুর্গা দুর্গা—কালী কালী এই সব আওড়াচ্ছেন।

গাবলুমামার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি—কেউ নেই। শুধু টেবিলের ওপর রঙচঙে একটা বেতের ঝুড়ি। তাতে বাছা বাছা সব বোম্বাই আম। ভগবানই বুদ্ধি দিলে রে প্যালা! কেউ দেখবার আগেই আমি ঘরে ঢুকে গোটাকয়েক বোম্বাই সরিয়ে ফেললুম—তার উপর সাজিয়ে দিলুম সাতটা পেশোয়ার কী আমীর—মানে, সাতটা অ্যাটম বম্!

তারপরে গোয়ালঘরে লুকিয়ে বসে সেই বোম্বাইগুলো সাবাড় করছি—দেখি না সেই ঝুড়িটা নিয়ে গাবলুমামা গটগটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর দাদু দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে সমানে 'কালী কালী' বলতে লাগলেন।

এইবার আমার চটকা ভাঙল। অ্যাঁ—ওই আম সাহেবের

কাছে ভেট যাচ্ছে! গাবলুমামার অবস্থা কী হবে ভেবে আমারই তো গায়ের রক্ত জমে গেল! চাকরি তো দূরে থাক—হাড়গোড় নিয়ে গাবলুমামা ফিরতে পারলে হয়! বেশ খানিকটা অনুতাপই হল এবার। ইস্—এ যে লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে গেল রে!

বললে বিশ্বাস করবিনি প্যালা—ওই আমের জোরেই শেষতক গাবলুমামার চাকরি হয়ে গেল। কী করে? সেইটেই তো আদত গল্প।

যে সায়েবটার সঙ্গে মামা দেখা করতে গেল, তার নাম ডার্কডেভিল। যতটা না বুড়ো হয়েছে—তার চাইতে বেশি ধরেছে বাতে। প্রায় নড়তে-চড়তে পারে না, একটা চেয়ারে বসে রাত-দিন কোঁ কোঁ করছে। তার হাতেই গাবলুমামার চাকরি।

আমের ঝুড়ি নিয়ে গাবলুমামা সায়েবকে সেলাম দিলে। তারপর নাক-টাক কুঁচকে, মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, মাই গার্ডেনস ম্যাংগো স্যার—ভেরি গুড স্যার—ফর ইয়োর ইটিং স্যার—

একদম চালিয়াতি—বুঝলি প্যালা? আমার মামারবাড়ির ধারে-কাছেও আমের গাছ নেই। তবু ও-সব বলতে হয়—গাবলুমামাও চালিয়ে দিলে।

সায়েবটা বেজায় লোভী, তায় রাত-দিন রোগে ভুগে লোভ আরো বেড়ে গিয়েছিল। আমের ঝুড়ি দেখেই সায়েবের নোলা সকসকিয়ে উঠল। তার ওপরে আবার সেই পেশোয়ার কী আমীর—তার যেমন গড়ন, তেমনি রঙ! তক্ষুনি সে ছুরি বের করলে টেবিলের টানা থেকে।

—কাম্ বাবু, হ্যাভ সাম (একটুখানি খাও)—বলেই এক টুকরো সে গাবলুমামার দিকে এগিয়ে দিলে।

—নো স্যার—আই ইট মেনি স্যার,—এইসব বলে গাবলু-মামা হাত-টাত কচলাতে লাগল। কিন্তু সায়েবের গোঁ—জানিস তো? ধরেছে যখন—খাইয়ে ছাড়বেই।

অগত্যা গাবলুমামাকে নিতেই হল টুকরোটা। আর মুখে দিয়েই—

—দাদা গো! গেলুম—বলে গাবলু মামা চেয়ার-শুদ্ধ উলটে পড়ে গেল। কষের একটা দাঁত নড়ছিল, সেটাও খসে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

আর সায়েব?

আমে কামড় দিয়েই বিটকেল আওয়াজ ছাড়লে: ও গশ্—ঘোঁয়াক!—তারপরেই তড়াক করে এক লাফে টেবিলে উঠে পড়ল। দাঁড়িয়ে উঠে বললে, মাই গড্—ঘ্যাঁচাং!

এই বলে আর-এক লাফ! মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছিল, সায়েব তার একটা ব্লেডকে চেপে ধরলে। তারপর ঘুরন্ত ফ্যানের সঙ্গে শূন্যে ঘুরতে লাগল বাঁই-বাঁই করে।

সে কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড—তোকে কী বলব প্যালা! ঘরের ভেতর নানারকম আওয়াজ শুনে সায়েবের আর্দালি ছুটে এসেছিল। সে সায়েবকে ফ্যানের সঙ্গে বনবনিয়ে ঘুরতে দেখে বললে, রাম-রাম—এ কেইস্যা কাম! বলে সে কাকের মতো হাঁ করে রইল।

আর সেই সময়েই ঘুরন্ত আর উড়ন্ত সায়েবের হাত থেকে পেশোয়ার কী আমীর টুপ্ করে খসে পড়ল। আর পড়বি তো পড় একেবারে আর্দালির হাঁ-করা মুখে!—এ দেশোয়ালী ভাই জান গই রে—বলে আর্দালি পাঁই-পাঁই করে একেবারে ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে এসে পড়ল। তখন মাদ্রাজ মেল ইস্টিশান

ছেড়ে চলে যাচ্ছে—এক লাফে তাতেই উঠে পড়ল আর্দালি, তারপরে পতন ও মূর্ছা। ওয়ালেটেয়ারে গিয়ে নাকি তার জ্ঞান হয়েছিল।

ততক্ষণে গাবলুমামার চটকা ভেঙেছে। মাথার ওপরে সায়েবের বুটের ঠোক্কর কাঁধে এসে লাগতেই গাবলুমামা টেনে ছুট। একদৌড়ে বাড়িতে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল—তারপরেই একশো চার জ্বর, আর তার সঙ্গে ভুল বকুনি ঃ ওই—ওই আম আসছে! আমায় ধরলে!

বাড়িতে তো কান্নাকাটি। আমার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছিস! কিন্তু পরের দিন তাজ্জব কাণ্ড! সকালেই সায়েবের দু-নম্বর চাপরাসি গাবলুমামার নামে এক চিঠি নিয়ে এসে হাজির।

ব্যাপার কী?

না—গাবলুমামার চাকরি হয়েছে। আড়াইশো টাকা মাইনের চাকরি।

কেমন করে হল? আরে, কেন হবে না? সায়েব তো ফ্যানের ব্লেড থেকে ছিটকে পড়ল। পড়তেই দেখে—আশ্চর্য ঘটনা! সায়েবের দশ বছরের বাত—হাত-পা ভালো করে নাড়তে পারত না—পেশোয়ার কী আমীরের এক ধাক্কাতেই সে বাত বাপ-বাপ করে পালিয়েছে। কাল সারা বিকেল সায়েব মাঠে ফুটবল খেলেছে, আনন্দে সকলকে ভেংচি কেটেছে, বাড়ি ফিরে তার পেল্লায় মোটা মেমসায়েবের সঙ্গে মারামারি করেছে পর্যন্ত।

আর গাবলুমামার জ্বর? তক্ষুনি রেমিশন! দশ বালতি জলে চান করে, ভাত খেয়ে, কোট-পেণ্টুলুন পরে গাবলুমামা তক্ষুনি সায়েবকে সেলাম দিতে ছুটল।

বুঝলি প্যালা—তাই বলছিলুম, টক আমকে অচ্ছেদ্দা করতে নেই ! জুৎ-মতো কাউকে খাইয়ে দিতে পারলে বরাত খুলে যায় ।

ডালমুটের ঠোঙাটা শেষ করে টেনিদা থামল ।

—আহা, এমন বাতের ওষুধ ! আমি বললুম, সে আম-গাছটা—

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেনিদা বললে, ও-সব ভগবানের দান রে,—বেশিদিন কি সংসারের থাকে ? পরদিনই কালবৈশাখী ঝড়ে গাছটা ভেঙে পড়ে গিয়েছিল ।

ডেসিম্যালের পরে আবার একটা ভেঙ্কুলাম, তার সঙ্গে ভগ্নাংশ। এমন জটিল জিনিসকে সরল করা অন্তত আমার কাজ নয়! পটলডাঙায় থাকি আর পটোল দিয়ে সিঙি মাছের ঝোল খাই —এসব গোলমালের মধ্যে পা বাড়িয়ে আমার কী দরকার?

পণ্ডিতমশায় যখন দাঁত খিচিয়ে 'লৃট্-লুঙকে' মাথায় ঢোকবার চেষ্টা করেন, তখন আমি আকুলভাবে 'ঘিনুন' আর 'আলু' প্রত্যয়ের কথা ভাবতে থাকি। ওর সঙ্গে যদি 'দাদখানি চাল' প্রত্যয় থাকত—তাহলে আর কোন দুঃখ থাকত না। তবে 'চাঁটি' আর 'গাঁট্টা' প্রত্যয়গুলো বাদ দেওয়া দরকার বলেই আমার ধারণা।

কিন্তু অঙ্ক আর সংস্কৃতর ধাক্কা যদি বা সামলানো যায়— ক্রিকেট খেলা ব্যাপারটা আমার কাছে স্রেফ রহস্যের খাসমহল। 'ক্রিকেট' মানে কি? বোধহয় ঝিঁঝি। দুপুরের কাটফাটা রোদ্দুরে চাঁদিতে ফোস্কা পড়িয়ে ওসব ঝিঁঝিঁ খেলা আমার ভাল লাগে না। মাথার ভেতরে ঝিঁঝি করতে থাকে আর মনে হয় —মস্ত একটা হাঁ করে কাছে কেউ ঝিঁঝিট খাম্বাজ গাইছে। অবশ্য ঝিঁঝিট খাম্বাজ কী আমার জানা নেই—তবে আমার মনে হয় ক্রিকেট অর্থাৎ ঝিঁঝি খেলার মতোই সেটাও ভয়াবহ।

অথচ কী গেরো ছাখো! পটলডাঙার থাণ্ডার ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাকেই ক্রিকেট খেলতে হচ্ছে। গোড়াতেই কিন্তু

বলে দিয়েছিলাম এসব আমার আসে না। আমি খুব ভাল চিয়ার-আপ্ করতে পারি, দু-এক গেলাস লেমন স্কোয়াশও নয় খাব ওদের সঙ্গে—এমনকি লাঞ্চ খেতে ডাকলেও আপত্তি করব না। কিন্তু ও-সব খেলা—টেলার ভেতরে আমি নেই—প্রাণ গেলেও না!

কিন্তু প্রাণ যাওয়ার আগেই কান যাওয়ার জো! আমাদের পটলডাঙার টেনিদাকে মনে আছে তো? সেই খাঁড়ার মতো উঁচু নাক আর রণডম্বরুর মতো গলা—যার চরিত-কথা তোমাদের অনেকবার শুনিয়েছি? সেই টেনিদা হঠাৎ গাঁক-গাঁক করে তার আধ মাইল লম্বা হাতখানা আমার কানের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

—খেলবি নে মানে? খেলতেই হবে তোকে! বল করবি—ব্যাট করবি—ফিল্ডিং করবি—ধাঁই করে আছাড় খাবি—মানে যা যা দরকার সবই করবি। সই না করিস, তোর ঐ গাধার মতো লম্বা লম্বা কানদুটো একেবারে গোড়া থেকে উবড়ে নেব—এই পাকা কথা বলে দিলুম!

গণ্ডারের মতো নাকের চাইতে গাধার কান ঢের ভাল। আমি মনে মনে বললাম। গণ্ডারের নাক মানে লোককে গুঁতিয়ে বেড়ানো, কিন্তু গাধার কান ঢের কাজে লাগে—অন্তত চটপট করে মশা-মাছি তো তাড়ানো যায়!

কিন্তু সেই কানদুটোকে টেনিদার হাতে বেহাত হতে দিতে আমার আপত্তি আছে। কী করি, রাজি হয়ে গেলাম।

তা, প্যাণ্ট-ট্যাণ্ট পরতে নেহাত মন্দ লাগে না। বেশ কায়দা করে বুক চিতিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ হতভাগা ক্যাবলা বললে, তোকে খাসা দেখাচ্ছে প্যালা!

—সত্যি?

একগাল হেসে ওকে একটা চকোলেট দিতে যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললে—বেগুন ক্ষেতে কাকতাড়ুয়া দেখেছিস ? ঐ যে মাথায় কেলে হাঁড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকে ? হুবহু তেমনি মনে হচ্ছে তোকে।

আমি ক্যাবলাকে একটা চাঁটি দিতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু তার আর দরকার হল না। হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বললে—আর তোরে কেমন দেখাইতে আছে ? তুই তো বজ্রবাঁটুল—পেণ্টুল পইর‍্যা য্যান চালকুমড়া সাজছস।

ক্যাবলা স্পীকটি নট ! একেবার মুখের মতো ! আমি খুশি হয়ে চকোলেটটা হাবুল সেনকেই দিয়ে দিলাম।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন টেনিদার হুকার শোনা গেল—এখানো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভ্যারাণ্ডা ভাজছিস প্যালা ? প্যাড পর্—দস্তানা পর্—তোকে আর ক্যাবলাকেই যে আগে ব্যাট করতে হবে।

আমাকে দিয়েই শুরু। পেটের মধ্যে পালাজ্বরের পিলেটা ধপাৎ করে লাফিয়ে উঠল একবার।

টেনিদা বললে, ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? যেই বল আসবে ঠাঁই করে পিটিয়ে দিবি ! আয়সা হাঁকড়াবি যে প্রথম বলেই ওভার বাউণ্ডারি—পারবি না ?

—পারা যাবে বোধহয়—কান-টান চুলকে আমি জবাব দিলাম।

—বোধহয় নয়, পারতেই হবে। তাড়াতাড়ি যদি আউট হয়ে যাস, তোকে আর আমি আস্ত রাখব না ! মনে থাকবে ?

এর মধ্যে হাবুল সেন আমার পায়ে আবার প্যাড পরিয়ে দিয়েছে, সেইটে পরে, হাতে ব্যাট নিয়ে দেখি, নড়াচড়া করাই শক্ত !

কাতর স্বরে বললাম ঃ হাঁটতেই পারছি না যে ! খেলব কী করে ?

—তুই হাঁটতে না পারলে আমার বয়েট গেল ! টেনিদা বিচ্ছিরি রকম মুখ ভ্যাংচালো ঃ বল মারতে পারলে আর রান নিতে পারলেই হল ।

—বা রে, হাঁটতেই যদি না পারি তবে রান নেব কেমন করে ?

—মিথ্যে বকাসনি প্যালা—মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে আমার ! হাঁটতে না পারলে দৌড়োনো যায় না ? কেন যায় না—শুনি ? তাহলে মাথা না থাকলেও কী করে মাথা ব্যথা হয় ? নাক না ডাকলেও লোক ঘুমোয় কী করে ? যা—যা, বেশি কঁ্যাচম্যাচ করিসনি ! মাঠে নেমে পড়্ !

একেবারে মোক্ষম যুক্তি ।

নামতেই হল অগত্যা । খালি মনে মনে ভাবছি প্যাড-ফ্যাড-শুদ্ধ পড়ে না যাই ! ব্যাটটাকে মনে হচ্ছে ভীমের গদার মতো ভারি—আগে থেকেই তো কব্জি টনটন করছে ! আমি ওটাকে হাঁকড়াব না ওটাই আমায় আগে হাঁকড়ে দেবে—সেইটেই ঠাহর করতে পারছি না ।

তাকিয়ে দেখি, পেছনে আর দু-পাশে খালি চোরবাগান টাইগার ক্লাব । ওদের সঙ্গেই ম্যাচ কিনা !

কিন্তু এ আবার কী রকম ঝিঁঝি খেলা ? ফুটবল তো দেখেছি সমানে সমানে লড়াই—এ ওর পায়ে ল্যাং মারছে—সে তার মাথায় ঢুঁ মারছে—আর বল সিধে এসপার ওসপার করবার জন্যে, সেই গোলকীপার দাঁড়িয়ে আছে ঘুঘুর মতো । এ পক্ষের একটা চিত হলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ও-পক্ষের আর একটা কাত । সে একরকম মন্দ নয় ।

কিন্তু এ কী কাপুরুষতা! আমাদের দু-জনকে কায়দা করবার জন্যে ওরা এগার জন! সেইসঙ্গে আবার দুটো আম্পায়ার! তাদের পেটে পেটে যে কী মতলব তাই বা কে জানে! আম্পায়ারদের গোল-গোল চোখ দেখে আমার তো প্রায় ভ্যামপায়ার বলে সন্দেহ হল।

তারপর লোকগুলোর দাঁড়িয়ে থাকার ধরন দেখ একবার! কেমন নাড়ুগোপালের মতো নুলো বাড়িয়ে উবু হয়ে আছে—যেন হরির লুটের বাতাসা ধরবে! সব দেখে শুনে আমার রীতিমতো বিচ্ছিরি লাগল।

এই রে—বল ছোড়ে যে! ব্যাট নিয়ে হাঁকড়াতে যাব—প্যাড-ট্যাড নিয়ে উলটে পড়ি আরকি! বলটা কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল দমদম বুলেটের মতো—একটু হলেই কানটা উড়িয়ে নিত। একটা ফাঁড়া তো কাটল! কিন্তু ওকি? আবার ছোড়ে যে!

জয় মা ফিরিঙ্গি পাড়ার ফিরিঙ্গি কালী! যা হোক এবার একটা কিছু হয়ে যাবে! বলি দেবার খাঁড়ার মতো ব্যাটটাকে মাথার উপর তুলে হাঁকিয়ে দিলাম। বলে লাগল না—স্রেফ পড়ল আমার হাঁটুর ওপরে। নিজের ব্যাটাঘাতে বাপ্‌রে বলে বসে পড়তেই দেখি, বলের চোটে স্টাম্প-ফাম্পগুলো কোথায় উড়ে বেরিয়ে গেছে।

—আউট—আউট!

চারদিকে বেদম চিৎকার। আম্পায়ার আবার মাথার ওপরে একটা হাত তুলে জগাই-মাধাইয়ের মতো দাঁড়িয়ে।

কে আউট হল? ক্যাবলা বোধহয়? আমি তক্ষুনি জানতাম! আমাকে কাকডাড়ুয়া বলে গাল দিয়েছে—আউট না হয়ে যায় কোথায়!

হাঁটুর চোটটা সামলে নিয়ে ব্যাট দিয়ে স্ট্যাম্পগুলো সব ঠিক করতে যাচ্ছি—হঠাৎ হতচ্ছাড়া আম্পায়ার বলে বসল—তুমি আউট, চলে যাও।

আউট? বললেই হল? আউট হবার জন্যেই এত কষ্ট করে প্যাড আর পেন্টলুন পরেছি নাকি? আবদার ত্মাখো একবার! বয়ে গেছে আমার আউট হতে!

বললাম, আমি আউট হব না। এখন আউট হবার কোন দরকার দেখছি না আমি।

আমি ঠিক বুঝেছিলাম ওরা আম্পায়ার নয়, ভ্যামপায়ার! কুইনিন চিবোবার মতো যাচ্ছেতাই মুখ করে বললেঃ দরকার না থাকলেও তুমি আউট হয়ে গেছ। স্টাম্প পড়ে গেছে তোমার।

—পড়ে গেছে তো কী হয়েছে—আমি রেগে বললাম, আবার দাঁড় করিয়ে দিতে কতক্ষণ? ওসব চালাকি চলবে না স্যার—এখনো আমার ওভার বাউণ্ডারি করা হয় নি!

কেন জানি না, চারদিকে ভারি যাচ্ছেতাই একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। চোরবাগান ক্লাবের লোকগুলোই বা কেন যে এরকম দাপাদাপি করছে, আমি কিছু বুঝতে পারলুম না।

তার মধ্যে আবার চালকুমড়ো ক্যাবলাটা ছুটে এল ওদিক থেকেঃ

চলে যা—চলে যা প্যালা! তুই আউট হয়ে গেছিস।

আর কতক্ষণ ধৈর্য থাকে এ অবস্থায়ঃ আমি চেঁচিয়ে বললাম, তোর ইচ্ছে থাকে তুই আউট হ-গে। আমি এখন ওভার বাউণ্ডারি করব।

আমার কানের কাছে সবাই মিলে তখন সমানে কিচির

মিচির করছে। আমি কান দিতাম না—যদি না কটাং করে আমার কানে টান পড়ত।

তাকিয়ে দেখি—টেনিদা।

ধাঁই করে আমার কাছ থেকে ব্যাট নিয়ে কানে একটা চিড়িং মেরে দিল—তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

—যা—যা উল্লুক! বেরো মাঠ থেকে! খুব ওস্তাদি হয়েছে, আর নয়!

রামছাগলের মতো মুখ করে অগত্যা আমায় চলে যেতে হল। মনে মনে বললাম, আমাকে আউট করা! আউট কাকে বলে সে আমি দেখিয়ে দেব!

গিয়ে তো বসলাম—কিন্তু কী তাজ্জব কাণ্ড! আমাদের দেখিয়ে দেবার আগেই চোরবাগানের টাইগার ক্লাব আউট দেখিয়ে দিচ্ছে! কারুর স্টাম্প উলটে পড়ছে। পেছনে যে লোকটা কাঙালী বিদায়ের মতো করে হাত বাড়িয়ে বসে আছে, সে আবার খুটুস করে স্টাম্প লাগিয়ে দিচ্ছে। কেউ বা মারবার সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠে বল লুফে নিচ্ছে। খালি আউট—আউট —আউট! এ আবার কী কাণ্ড রে বাবা!

আমাদের পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাব ব্যাট বগলে যাচ্ছে আর আসছে। এমন যে ডাকসাইটে টেনিদা, তারও বল একটা রোগা-পটকা ছেলে কটাং করে কামড়ে নিলে। হবেই তো! এদিকে মোটে দু-জন—ওদিকে এগারো, সেইসঙ্গে আবার দুটো আম্-পায়ার। কোন ভদ্দরলোক ঝিঁঝি খেলতে পারে কখনো!

ঐ চালকুমড়ো ক্যাবলাটাই টিকে রইল শেষ-তক। কুড়ি না একুশ রান করল বোধহয়। পঞ্চাশ রান না পেরুতেই পটল-ডাঙা থাণ্ডার ক্লাব বেমালুম সাফ।

এইবার আমাদের পালা। ভারি খুশি হল মনটা। আমরা এগারো জন এবারে তোমাদের নিয়ে পড়ব। আম্পায়ার দুটোও দেখি ওদের দল ছেড়ে আমাদের সঙ্গে এসে ভিড়েছে। কিন্তু ওদের মতলব ভাল নয় বলেই আমার বোধ হল।

ক্যাপ্টেন টেনিদাকে বললাম, আম্পায়ারদুটোকে বাদ দিলে হয় না? ওরা নয় ওদের সঙ্গেই ব্যাট করুক?

টেনিদা আমাকে রদ্দা মারতে এল। বললে, বেশি ওস্তাদি করিস নি প্যালা! ওখানে দাঁড়া। একটা ক্যাচ ফেলেছিস কি ঘ্যাঁচ করে কান কেটে দেব! ব্যাট তো খুব করছিস—এবার যদি ঠিকমতো ফিল্ডিং করতে না পারিস, তাহলে তোর পালাজ্বরের পিলে আমি আস্ত রাখব না!

হাবুল সেন বল করতে গেল।

প্রথম বলেই—ওরে বাপরে! টাইগার ক্লাবের সেই রোগা ছোকরাটা কী একখানা হাঁকড়ালে! বোঁ করে বল বেরিয়ে গেল, একদম বাউণ্ডারি। ক্যাবলা প্রাণপণে ছুটেও রুখতে পারলে না।

পরের বলেও আবার সেই হাঁকড়ানি। তাকিয়ে দেখি কামানের গুলির মতো বলটা আমার দিকেই ছুটে আসছে।

একটু দূরেই ছিল আমাদের পাঁচুগোপাল। চেঁচিয়ে বললে, প্যালা—ক্যাচ—ক্যাচ—

—ক্যাচ! ক্যাচ! দূরে দাঁড়িয়ে ওরকম সবাই-ই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করতে পারে! ঐ বল ধরতে গিয়ে আমি মরি আর কি! তার চাইতে বললেই হয়, পাঞ্জাব মেল ছুটছে প্যালা লুফে নে?

মাথা নিচু করে আমি চুপ করে বসে পড়লাম—আবার বল বাউণ্ডারি পার।

হৈ-হৈ করে টেনিদা ছুটে এল।

—ধরলি নে যে ?

—ও ধরা যায় না !

—ধরা যায় না ? ইস—এমন চমৎকার ক্যাচটা, এক্ষুনি আউট হয়ে যেত !

—সবাইকে আউট করে লাভ কী ? তাহলে খেলবে কে ? আমরাই তো আউট হয়ে গেছি—এখন খেলুক না ওরা !

—খেলুক না ওরা !—টেনিদা ভেংচি কাটল—তোর মতো গাড়োলকে খেলায় নামানোই আমার ভুল হয়েছে ! যা—যা—বাউণ্ডারি লাইনে চলে যা !

চলে গেলাম। আমার কী ! বসে বসে ঘাসের শীষ চিবুচ্ছি। দুটো একটা বল এদিক ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল, ধরার চেষ্টা করেও দেখলাম। বোঝা গেল, ওসব ধরা যায় না। হাতের তলা দিয়ে যেমন শোল মাছ গলে যায়—তেমনি সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে পিছলে বাউণ্ডারি লাইন পেরিয়ে যেতে লাগল।

আর সাবাস বলতে হবে চোরবাগান টাইগার ক্লাবের ঐ রোগা ছোকরাকে ! ডাইনে মারছে, বাঁয়ে মারছে, চটাং করে মারছে, শাঁই করে মারছে, ধাঁই করে মারছে ! একটা বলও বাদ যাচ্ছে না ! এর মধ্যেই বেয়াল্লিশ রান করে ফেলেছে একাই। দেখে ভীষণ ভাল লাগল আমার। পকেটে চকোলেট থাকলে দুটো ওকে আমি খেতে দিতাম।

হটাৎ বল নিয়ে টেনিদা আমার কাছে হাজির।

—ব্যাটিং দেখলাম, ফিল্ডিংও দেখছি। বল করতে পারবি ?

এতক্ষণ ঝিঁঝি খেলা দেখে আমার মনে হয়েছিল—বল করাটাই সবচেয়ে সোজা। একপায়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম—খুব পারব। এ আর শক্তটা কী ?

—ওদের ঐ রোগাপট্‌কা গোঁসাইকে আউট করা চাই। পারবিনে ?

—এক্ষুনি আউট করে দিচ্ছি—কিছু ভেবো না !

আমি আগেই জানি, আম্‌পায়ারছুটোর মতলব খারাপ। সেই-জন্যেই আমাদের দল থেকে ওদের বাদ দিতে বলেছিলাম—টেনিদা কথাটা কানে তুলল না। যেই প্রথম বলটা দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে বললে—নো বল !

নো বল তো নো বল—তোদের কী ! বলতেও যাচ্ছিলাম, কিন্তু গোঁসাই দেখি আবার ধাঁই করে হাঁকড়ে দিয়েছে, বাউণ্ডারি তো তুচ্ছ—একেবারে ওভার বাউণ্ডারি।

আর চোরবাগান টাইগার ক্লাবের সে কী হাততালি ! একজন তো দেখলাম আনন্দে ডিগবাজি খাচ্ছে।

এইবার আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে আগুন জ্বলে গেল। মাথায় টিকি নেই—যদি থাকত, নিশ্চয় তেজে রেফের মতো খাড়া হয়ে উঠত। বটে—ডিগবাজি ! আচ্ছা—দাঁড়াও ! বল হাতে ফিরে পেতেই ঠিক করলাম—এবার গোঁসাইকে একেবারে আউট করে দেব ! মোক্ষম আউট !

প্যাডটা বোধহয় ঢিলে হয়ে গেছে—গোঁসাই পেছন ফিরে সেটা বাঁধছিল। দেখলাম, এই সুযোগ। ব্যাট নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালে কিছু করতে পারব না—এই সুযোগেই কর্ণবধ !

মামার বাড়িতে আম পেড়ে পেড়ে হাতের টিপ হয়ে গেছে—আর ভুল হল না। আম্‌পায়ার না ভ্যাম্‌পায়ার হাঁ-হাঁ করে ওঠবার আগেই বোঁ করে বল ছুড়ে দিলাম।

নির্ঘাত লক্ষ্য ! গোঁসাইয়ের মাথায় গিয়ে খটাং করে বল লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই—'ওরে বাবা !' গোঁসাই মাঠের মধ্যে ফ্ল্যাট !

আউট যাকে বলে! অন্তত এক হপ্তার জন্যে বিছানায় আউট!

আরে—একি, একি! মাঠশুদ্ধ লোক তেড়ে আসছে যে! 'মার মার' করে আওয়াজ উঠছে যে! অ্যাঁ—আমাকেই নাকি?

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। কান ঝিঁ-ঝিঁ করছে, প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে এবারে টের পাচ্ছি—আসল ঝিঁঝি খেলা কাকে বলে!

গোলটা আমিই দিয়েছি। এখনও চিৎকার শোনা যাচ্ছে ওদের —থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ্ হিপ্ হুররে! এখন আমাকে ঘাড়ে করে নাচা উচিত ছিল সকলের। পেট ভরে খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল ভীমনাগের দোকানে কিংবা দেলখোশ রেস্তোরাঁয়। কিন্তু তার বদলে একদল পিনপিনে বিদিকিচ্ছি মশার কামড় খাচ্ছি আমি। চটাস্ করে মশা মারতে গিয়ে নিজের নাকেই লেগে গেল একটা রাম-থাপ্পড়। একটু উঁ-আঁ করে কাঁদব তারও উপায় নেই। প্যাঁচপেঁচে কাদার ভেতরে কচুবনের আড়ালে মূর্তিমান কানাই সেজে বসে আছি, আর আমার চারি-দিকে মশার বাঁশি বাজছে।

থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম! আবার চিৎকার শোনা গেল। একটা মশা পটাস করে হুল ফোটালো ডান গালে। ধাঁ করে চাঁটি হাঁকালুম—নিজের চড়ে নিজেরই মাথা ঘুরে গেল। অঙ্কের মাস্টার গোপীবাবুও কখনো এমন চড় হাঁকড়েছেন বলে মনে পড়ল না।

গেছি-গেছি বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে বাপ-বাপ করে সামলে নিলুম। দমদমার এই কচুবনে আপাতত আরো ঘণ্টাখানেক আমার মৌনতার সাধনা। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগে এখান থেকে বেরুবার উপায় নেই আমার।

চিৎকারটা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছেঃ থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!

আমি পটলডাঙার প্যালারাম—পালাজ্বরে ভুগি আর বাসক-পাতার রস খাই। কিন্তু পটলডাঙা ছেড়ে শেষে এই দমদমার কচুবনে আমার পটল তোলবার জো হবে—এ কথা কে জানত!

আমাদের পটলডাঙার থাণ্ডার ফুটবল ক্লাবের আমি একজন উৎসাহী সদস্য। নিজে কখনো খেলি না, তবে সব সময়েই খেলোয়াড়দের প্রেরণা দিয়ে থাকি। আমাদের ক্লাব কোন খেলায় গোল দিলে সাত দিন আমার গলাভাঙা সারে না। হঠাৎ যদি কোন খেলায় জিতে যায়—যা প্রায় কোনদিনই হয় না—তাহলে আনন্দের চোটে আমার কম্প দিয়ে পালাজ্বর আসে।

সদস্য হয়েই ছিলুম ভাল। গোলমাল বাধল খেলোয়াড় হতে গিয়ে।

দমদমার ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ। তিনদিন আগে থেকে ছোটদির ভাঙা হারমোনিয়ামটা নিয়ে আমি ধ্রুপদ গাইতে চেষ্টা করছি। গান গাইবার জন্যে নয়—খেলার মাঠে যাতে সারাক্ষণ একটানা চেঁচিয়ে যেতে পারি—সেই উদ্দেশ্যে। তেতলার ঘর থেকে মেজদা যখন বড় একটা ডাক্তারির বই নিয়ে তেড়ে এল, তারপরেই বন্ধ করতে হল গানটা।

কিন্তু দমদমে পৌঁছেই একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শোনা গেল।

আমাদের দুই জাঁদরেল খেলোয়াড় ভণ্টু আর ঘণ্টু দুই ভাই। দুজনেই মুগুর ভাঁজে আর দমাদ্দম ব্যাকে খেলে। বলের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দেয় অন্য দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে। আজ পর্যন্ত দুজনে যে কত লোকের ঠ্যাং ভেঙেছে তার হিসেব নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবেরই ঠ্যাং ভাঙল। একেবারে দুটো ঠ্যাং ভাঙল। একেবারে দুটো ঠ্যাংই একসঙ্গে।

কাশীতে ওদের কুট্টিমামা থাকে। তা থাক—কাশি-সর্দি-পালাজ্বর—যেখানে খুশি থাক। কিন্তু কুট্টিমামা কি আর বিয়ে করার দিন পেল না? ঠিক আজ দুপুরেই টেলিগ্রামটা এসে হাজির। আর বিশ্বাসঘাতক ভণ্টু আর ঘণ্টু সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে হাওড়া স্টেশনে। থাণ্ডার ক্লাবকে যেন দুটো আণ্ডার-কাট ঘুসি মেরে চিত করে ফেলে দিয়ে গেল!

দলের ক্যাপ্টেন পটলডাঙার টেনিদা বাঘের মতো গর্জন করে উঠল: মামার বিয়ের খ্যাঁট গেলবার লোভ সামলাতে পারলে না! ছোঃ! নরাধম—লোভী—কাপুরুষ! ছোঃ!

গাল দিয়ে গায়ের ঝাল মিটতে পারে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবের সদস্যেরা তখন বাসি মুড়ির মতো মিইয়ে গেছে সবাই। ভণ্টু ঘণ্টু নেই—এখন কে বাঁচাবে ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের হাত থেকে? ওদের দুঁদে ফরোয়ার্ড ন্যাড়া মিত্তির দারুণ ট্যারা। আমাদের গোলকীপার গোবরা আবার ট্যারা দেখলে বেজায় ভেবড়ে যায়—কোন্ দিক থেকে যে বল আসবে ঠাহর করতে পারে না। ওই ট্যারা ন্যাড়াই হয়ত একগণ্ডা গোল ঢুকিয়ে দিয়ে বসে থাকবে।

এখন উপায়?

টেনিদার ছোকরা চাকর ভজুয়া গিয়েছিল সঙ্গে। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা—মারামারি বাধলে কাজে লাগবে মনে করেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। টেনিদা কটমট করে খানিকটা তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, এই ভজুয়া—ব্যাকে খেলতে পারবি?

ভজুয়া খৈনি টিপছিল। টপ করে খানিকটা খৈনি মুখে পুরে নিয়ে বললে, সেটা ফির কী আছেন ছোটবাবু?

—পায়ের কাছে বল আসবে—ধাঁই করে মেরে দিবি। পারবি না ?

—হাঁ খুব পারবে। বল ভি মারিয়ে দিবে—আদমি ভি মারিয়ে দিবে ! ভজুয়ার চোখে-মুখে জ্বলন্ত উৎসাহ।

—না না, আদমিকে মারিয়ে দিতে হবে না। শুধু বল মারলেই হবে। পারবি তো ঠিক ?

—কেনো পারবে না ?—কাল রাস্তামে একঠো কুত্তা ঘেউ-ঘেউ করতে করতে আইল তো মারিয়ে দিলাম একঠো জোরসে লাথি। এক লরি যাইতেছিল—লাথ্ খাইয়ে একদম উস্‌কো উপর চড়িয়ে গেল। ব্যাস্—সিধা হাওড়া টিশন !

—থাম—থাম—মেলা বকিস নি—টেনিদা একটা নিশ্চিন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঃ একটা ব্যাক তো পাওয়া গেল ! আর একটা—আর একটা—এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখ পড়ল আমার ওপরে ঃ—ঠিক হয়েছে ! প্যালাই খেলবে।

—আমি !

একটা চিনেবাদাম চিবুতে যাচ্ছিলুম, সেটা গিয়ে গলায় আটকালো।

—কেন—তুই তো বলেছিলি, শিমুলতলায় বেড়াতে গিয়ে কাদের নাকি তিনটে গোল দিয়েছিলি একাই ? সে-সব বুঝি স্রেফ গুলপট্টি ?

গুলপট্টি তো নির্ঘাত। চাটুজ্জেদের রকে বসে তেলে-ভাজা খেতে খেতে সবাই দুটো-চারটে গুল দেয়, আমিও ঝেড়েছিলুম একটা। কিন্তু যে টেনিদা দু-বার ম্যাট্রিকে গাড্ডা খেয়েছে, তার মেমোরি এত ভাল কে জানত ?

বাদামটা গিলে ফেলে আমি বললুম, না না, গুলপট্টি হবে কেন! পালাজ্বরে কাহিল করে দিয়েছে—নইলে এতদিনে আমি মোহনবাগানে খেলতুম, তা জানো? এখন দৌড়োতে গেলে পিলেটা একটু নড়ে—এই যা অসুবিধে।

—পিলেই তো নড়াবি। পিলে নড়লে তোর পালাজ্বরও সরে পড়বে—এই বলে দিলুম। নে—নেমে পড়্—

ফুর্—র্—র্—র্—

রেফারির বাঁশির আওয়াজ। আমি কি বলতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই এক ধাক্কায় টেনিদা আমাকে ছিটকে দিলে মাঠের ভেতরে। পড়তে-পড়তে সামলে নিলুম। ভেবে দেখলুম, গোলমাল বেশি বাড়ানোর চাইতে দু-একটা গোল দেওয়ার চেষ্টা করাই ভাল।

যা থাকে কপালে! আজ প্যালারামেরই একদিন কি পালা-জ্বরেরই একদিন!

খেলা শুরু হল।

ব্যাকে দাঁড়িয়ে আছি। ভেবেছিলুম ভজুয়া একাই ম্যানেজ করবে—কিন্তু দেখা গেল, মুখ ছাড়া আর কোন পুঁজিই ওর নেই। একটা বল পায়ের কাছে আসতেই রাম শট হাঁকড়ে দিলে। কিন্তু বলে পা লাগল না—উলটে ধড়াস করে শুকনো মাঠে একটা আছাড় খেল ভজুয়া। ভাগ্যিস গোলকীপার গোবরা তক্কে-তক্কে ছিল—নইলে ঢুকেছিল আর-কি একখানা!

হাই কিক্ দিয়ে গোবরা বলটাকে মাঝখানে পাঠিয়ে দিলে। রাইট আউট হাবুল সেন বলটা নিয়ে পাঁই-পাঁই করে ছুটল—ফাঁড়া কাটল এ যাত্রা।

কিন্তু ফুটবল মাঠে সুখ আর কতক্ষণ কপালে থাকে! পরক্ষণেই দেখি বল দ্বিগুণ বেগে ফিরে আসছে আমাদের দিকে—আর নিয়ে আসছে ট্যারা ন্যাড়া মিত্তির।

ভজুয়া বোঁ-বোঁ করে ছুটল—কিন্তু ন্যাড়া মিত্তিরকে ছুঁতেও পারল না। খুট করে ন্যাড়া পাশ কাটিয়ে নিলে, ভজুয়া একেবারে লাইন টপকে গিয়ে পড়ল লাইন্‌স্‌ম্যান ক্যাবলার ঘাড়ে।

কিন্তু ভজুয়ার যা খুশি হোক—আমার তো শিরে সংক্রান্তি। এখন আমি ছাড়া ন্যাড়া মিত্তির আর গোলকীপার গোবরার ভেতর আর কেউ নেই। গোবরাকে তো জানি। ন্যাড়ার ট্যারা চোখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে—কোন্ দিক দিয়ে বল যে গোলে ঢুকছে টেরও পাবে না।

—চার্জ! চার্জ!—সেণ্টারহাফ টেনিদার চিৎকার: প্যালা, চার্জ—

জয় মা কালী! এমনিও গেছি—অমনিও গেছি! দিলুম পা ছুড়ে। কিমাশ্চর্যম্! ন্যাড়া মিত্তির বোকার মতো দাঁড়িয়ে—বলটা সোজা ছুটে চলে গেছে হাবুল সেনের কাছে।

—ব্রেভো, ব্রেভো প্যালা!—চারদিক থেকে চিৎকার উঠল: ওয়েল সেভ্‌ড্!

তাহলে সত্যিই আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি! আমি পটলডাঙার প্যালারাম, ছেলেবেলায় টেনিস বল ছাড়া যে কখনো পা দিয়ে ফুটবল ছোঁয়নি—সেই আমি ঠেকিয়েছি দুর্ধর্ষ ন্যাড়া মিত্তিরকে! আমার চব্বিশ ইঞ্চি বুক গর্বে ফুলে উঠল। মনে হল, ফুটবল খেলাটা কিছুই নয়। ইচ্ছে করে এতদিন খেলিনি বলেই মোহনবাগানে চান্স পাইনি!

কিন্তু আবার যে ন্যাড়া মিত্তির আসছে! ওর পায়ে কি চুম্বক আছে? সব বল কি ওর পায়ে গিয়ে লাগবে?

দু-বার অপদস্থ হয়ে ভজুয়া ক্ষেপে গিয়েছিল। মরিয়া হয়ে চার্জ করল, কিন্তু রুখতে পারল না। তবু এবারেও গোল বাঁচল। তবে গোবরা নয়—একরাশ গোবর। ঠিক সময়-মতো তাতে পা পিছলে পড়ে গেল ন্যাড়া মিত্তির, আমি ধাঁই করে শট মেরে ক্লিয়ার করে দিলুম। ওদের লেফ্ট্ আউটের পায়ে লেগে থ্রো হয়ে গেল সেটা।

কিন্তু আত্মবিশ্বাস ক্রমেই বাড়ছে। পটলডাঙার থাণ্ডার ক্লাবের চিৎকার সমানে শুনছি ঃ ব্রেভো প্যালা—সাবাস! আরে, আবার যে বল আসে! আমাদের ফরোয়ার্ডগুলো কি ঘোড়ার ঘাস কাটছে নাকি? গেল-গেল করতে করতে ওদের বেঁটে রাইট ইনটা শট করলে—আমার পায়ের তলা দিয়ে বল উড়ে গেল গোলের দিকে।

গো—ও—ও—

ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের চিৎকার। কিন্তু 'ওল' আর নয়, স্রেফ কচু। অর্থাৎ বল তখন পোস্ট ঘেঁসে কচুবনে অন্তর্ধান করেছে। গোল কিক্।

কিন্তু এর মধ্যেই একটা কাণ্ড করেছে ভজুয়া। বলকে তাড়া করে গিয়ে শট করে দিয়েছে গোল-পোস্টের গায়ে। আর তার পরেই আঁই-আঁই করতে করতে বসে পড়েছে পা চেপে ধরে।

ভজুয়া ইনজিওর্ড। ধরাধরি করে দু-তিনজন তাকে বাইরে নিয়ে গেল।

আপদ গেল। যা খেলছিল—পারলে আমিই ওকে ল্যাং মেরে দিতুম। গোল-পোস্টটাই আমার হয়ে কাজ সেরে দিয়েছে।

কিন্তু এখন যে আমি একেবারে একা। ‘একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়’—! এলোপাথাড়ি কাটল কিছুক্ষণ। ভগবান ভরসা—আমাকে আর বল ছুঁতে হল না। গোটা-দুই গোবরা এগিয়ে এসে লুফে নিলে, গোটাতিনেক সামলে নিলে হাফ-ব্যাকেরা! তারপর হাফ-টাইমের বাঁশি বাজল।

আঃ—কোনমতে ফাঁড়া কাটল এ পর্যন্ত। বাকি সময়টুকু সামলে নিতে পারলে হয়!

পেটের পিলেটা একটু টনটন করছে—বুকের ভেতরও খানিকা ধড়ফড়ানি টের পাচ্ছি। কিন্তু চারদিক থেকে তখন থাণ্ডার ক্লাবের অভ্যর্থনা: রেড়ে খেলছিস প্যালা, সাবাস! এমনকি ক্যাপ্টেন টেনিদা পর্যন্ত আমার পিঠ থাবড়ে দিলে:

—তুই দেখছি রেগুলার ফার্স্ট ক্লাস প্লেয়ার! নাঃ—এবার থেকে তোকে চান্স দিতেই হবে দু-একবার!

এতে আর কার পিলে-টিলের কথা মনে থাকে? বিজয়গর্বে দু-গ্লাস লেবুর সরবত খেয়ে নিলুম। শুধু ভজুয়া কিছু খেল না—পায়ে একটা ফেটি বেঁধে বসে রইল গোঁজ হয়ে। টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, শুধু এক-নম্বরের বাক্যি-নরেশ!—এক লাথ্ সে কুত্তাকো লরিমে চড়া দিয়া! তবু একটা বল ছুঁতে পারলে না—ছোঃ—ছোঃ!

ভজুয়া দুচোখে জিঘাংসা নিয়ে তাকিয়ে রইল।

আবার খেলা শুরু হল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভজুয়া আবার নামল মাঠে। আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, দেখিয়ে প্যালাবাবু—ইস্ দফে হাম মার ডালেঙ্গে!

ভজুয়ার চোখ দেখে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া! সর্বনাশ—আমাকে নয় তো?

—সে কী রে! কাকে?

—দেখিয়ে না—

কিন্তু আবার সে আসছে! 'ওই আসে—ওই অতি ভৈরব হরষে'! আর কে? সেই ন্যাড়া মিত্তির! ট্যারা চোখে সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি! এবার গোল না দিয়ে ছাড়বে বলে মনে হয় না!

ক্ষ্যাপা মোষের মতো ছুটল ভজুয়া। তারপরই 'বাপ্' বলে এক আকাশ-ফাটা চিৎকার! বল ছেড়ে ন্যাড়া মিত্তিরের পাঁজরায় লাথি মেরেছে ভজুয়া, আর ন্যাড়া মিত্তির ঝেড়েছে ভজুয়ার মুখে এক বোম্বাই ঘুসি। তারপর দু-জনেই ফ্ল্যাট এবং দু-জনেই অজ্ঞান। ভজুয়া প্রতিশোধ নিয়েছে বটে, কিন্তু এটা জানত না যে ন্যাড়া মিত্তির নিয়মিত বক্সিং লড়ে।

মিনিট-তিনেক খেলা বন্ধ। পটলডাঙার থাণ্ডার ক্লাব আর দমদম ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের মধ্যে একটা মারামারি প্রায় বেধে উঠেছিল—দু-চারজন ভদ্রলোক মাঝখানে নেমে পড়ে থামিয়ে দিলেন। ফের খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু ভজুয়া আর ফিরল না—ন্যাড়া মিত্তিরও না।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, ন্যাড়া বেরিয়ে যাওয়াতে দলের কোমর ভেঙে গেছে ওদের। তবু হাল ছাড়ে না ভ্যাগাবণ্ড ক্লাব। বার-বার তেড়ে আসছে। আর, কী হতচ্ছাড়া ওই বেঁটে রাইট-ইনটা!

—অফ সাইড!—রেফারির হুইসল। আর-একটা ফাঁড়া কাটল।

পটলডাঙা ক্লাবের হাফ ব্যাকেরা এতক্ষণে যেন একটু দাঁড়াতে পেরেছে। আমার পা পর্যন্ত আর বল আসছে না। খেলার প্রায় মিনিট-তিনেক বাকি। এইটুকু কোনমতে কাটাতে পারলেই

মানে মানে বেঁচে যাই—পটলডাঙার প্যালারাম বীরদর্পে ফিরতে পারে পটলডাঙায়।

এই রে! আবার সেই বেঁটেটা! কখন চলে এসেছে কে জানে! এ যে ন্যাড়া মিত্তিরের ওপরেও এক-কাঠি! নেংটি ইঁদুরের মতো বল মুখে করে দৌড়তে থাকে! আমি কাছে এগোবার আগেই বেঁটে কিক করেছে। থাণ্ডার ক্লাব বাঁয়ে শেয়াল নিয়ে নেমেছিল নির্ঘাত! ডাইভ করে বলটা ধরতে পারলে না গোবরা—তবু এবারেও বল পোস্ট ঘেঁসে বাইরে চলে গেল।

কিন্তু ন্যাড়া মিত্তিরকে যে গোবরটা কাত করেছিল—সেটা এবার আমায় চিত করল। একখানা পেল্লায় আছাড় খেয়ে যখন উঠে পড়লুম তখন পেটের পিলেটায় সাইক্লোন হচ্ছে! মাথার ভেতরে যেন একটা নাগরদোলা ঘুরছে বোঁ-বোঁ করে। মনে হচ্ছে, কম্প দিয়ে পালাজ্বর এল বুঝি!

আর এক মিনিট। আর এক মিনিট খেলা বাকি। রেফারি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে বার-বার। ড্র যাবে নির্ঘাত। যা খুশি হোক—আমি এখন মাঠ থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি! আমার এখন নাভিশ্বাস! গোবরে আছাড় খেলে মাথা এমন বোঁ-বোঁ করে ঘোরে কে জানত!

গোল-কিক্।

আবছাভাবে গোবরার গলার স্বর শুনতে পেলুম: কিক কর্ প্যালা—

শেষের বাঁশি প্রায় বাজল। চোখে ধোঁয়া দেখছি আমি। এইবার প্রাণ খুলে একটা কিক করব আমি! মোক্ষম কিক! জয় মা কালী—

প্রাণপণে কিক্ করলুম। গো—ও-ওল—গো—ও-ও-ল—! চিৎকারে আকাশ ফাটার উপক্রম! প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলুম না। এত জোরে কি শট মেরেছি যে আমাদের গোল-লাইন থেকেই ওদের গোলকীপারকে ঘায়েল করে দিয়েছি?

কিন্তু সত্য-দর্শন হল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই। গোবরা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আমাদের গোলের নেটের ভেতরেই বলটা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন আমার কীর্তি দেখে বলটাও হতভম্ব হয়ে গেছে।

তারপর?

তারপর খেলার মাঠ থেকে এক মাইল দূরের এই কচুবনে কানাই হয়ে বসে আছি। দূর থেকে এখনো ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের চিৎকার আসছে: থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ-হিপ হুররে!

———

ভজগৌরাঙ্গ-কথা

হাবুল সেন বর্ধমানে মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে। ক্যাবলা গেছে বাবা মার সঙ্গে নইনিতালে। তাই পুজোর ছুটিতে পটলডাঙা আলো করে আছি চার মূর্তির দু-জন—আমি আর টেনিদা।

বিকেলবেলা ভাবছি ধাঁ করে লিলুয়ায় ছোট পিসিমার বাড়ি থেকে একটু বেড়িয়ে আসি—হঠাৎ বাইরে থেকে টেনিদার গাঁক গাঁক করে চিৎকার:

—প্যালা, কাম—কুইক!

নতুন ডাক্তার মেজদা হসপিটালে গোটাকতক রুগী-টুগী মেরে ফিরে আসছিল। নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাঁত খিচিয়ে আমায় বলে গেল: যাও জাম্বুবান—তোমার দাদা হনুমান তোমায় ডাকছে। দু-জনে মিলে এখন লঙ্কা পোড়াওগে।

জাম্বুবান কখনও লঙ্কা পোড়ায় নি—মেজদাকে এই কথা বলতে গিয়েও আমি বললুম না। ওকে চটিয়ে দিলে মুশকিল। একটু পেটের গণ্ডগোল হয়েছে কি, সঙ্গে সঙ্গে সাতদিন হয়ত সাগুবার্লি কিংবা স্রেফ কাঁচকলার ঝোল খাইয়ে রাখবে, নইলে পটাং করে পেটেই একটা ইনজেকশন দিয়ে দেবে। তাই মিথ্যে অপবাদটা হজম করে যেতে হল।

আবার টেনিদার সেই পাড়া-কাঁপানো বাজখাই হাঁক: প্যালা, আর ইউ ডেড?

টেনিদার চিৎকার শুনলে মড়া অবধি লাফিয়ে ওঠে, আর আমি তো এখনো মারাই যাই নি। হুড়মুড় করে দোতলা থেকে নেমে এসে বললুম : কী হয়েছে, চ্যাচাচ্ছ কেন অত ?

টেনিদা আমার চাঁদির ওপর কড়াং করে একটা গাঁট্টা মারল। বললে : তুই একটা নীরেট ভেট্‌কি মাছ! আমি তো শুধু চ্যাচাচ্ছি—ব্যাপারটা শুনলে তুই একেবারে 'ভজগৌরাঙ্গ' 'ভজ-গৌরাঙ্গ' বলে দু-হাত তুলে নাচতে থাকবি! যাকে বলে নরীনৃত্যতি।

কাণ্ডটা দেখ একবার—টেনিদা সংস্কৃত আওড়াচ্ছে! পণ্ডিত-মশাই একবার ওকে 'গো' শব্দরূপ জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, গৌ—গৌবৌ—গৌবরঃ! শুনে পণ্ডিতমশাই চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে যেতে যেতে সামলে গিয়েছিলেন। আর ওকে বলেছিলেন—কী বলেছিলেন, সেটা না-ই বা শুনলে!

কিন্তু সংস্কৃত যখন বলছে, তখন ব্যাপারটা নিশ্চয় সাঙ্ঘাতিক। বললুম : খামোকা আমি নাচব কেন? আর যদিই বা নাচি ভজ-গৌরাঙ্গ বলব কেন? তোমার নাম ধরে ভজহরি ভজহরি বলেও তো নাচতে পারি! (তোমরা তো জানোই, টেনিদার পোশাকী নাম ভজহরি মুখুজ্জে।)

টেনিদা আমার নাকের সামনে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বললে : ভজহরি বলে নাচলে কচুপোড়া পাবি! আরে, আজ সন্ধের পর ভজগৌরাঙ্গবাবু যে পোলাও-মাংস খাওয়াচ্ছেন! তোকে আর আমাকে!

শুনে খানিকক্ষণ আমি হাঁ করে থাকলুম।

—কে খাওয়াচ্ছে বললে!

—ভজগৌরাঙ্গবাবু।

আমার হাঁ-টা আরও বড় হল ঃ ভাল করে বল, বুঝতে পারছি না।

বলেই বুঝতে পারলুম, কী ভুলটাই করেছি। টেনিদা সঙ্গে সঙ্গে আমার কানের কাছে মুখ এনে 'ভজগৌরাঙ্গ' বলে এমন একখানা হাঁক ছাড়ল যে আমি আঁতকে তিন হাত লাফিয়ে উঠলুম। কান কন-কন করতে লাগল, মাথা বন-বন করে উঠল।

টেনিদা হিড়-হিড় করে টানতে টানতে আমাকে চাটুজ্জেদের রোয়াকে নিয়ে এল। বললে, শুনে যে তো মুচ্ছো যাওয়ার জো হল দেখছি! বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি?

বাঁ দিকের কানটা চেপে ধরে আমি বললুম ঃ ভজগৌরাঙ্গ আমাদের মাংস-পোলাও খাওয়াবে?

—আলবাত! তোকে আর আমাকে।

—ভজগৌরাঙ্গ সমাদ্দার?

—নির্ঘাত!

বলে কী টেনিদা! পাগল হয়ে গেছে, না পেট খারাপ হয়েছে? ভজগৌরাঙ্গবাবুর মতো কৃপণ সারা কলকাতায় আর দু-জন নেই। একাই থাকেন। ওঁর ছেলে রামগোবিন্দ চাকরি পেয়েই নিজের মাকে নিয়ে কেষ্টনগরে চলে গেছে—মানে পালিয়ে বেঁচেছে। ভজগৌরাঙ্গ পাটের দালালি করছেন, আর টাকা জমাচ্ছেন। বাড়ির সামনে ভিক্ষুক এলে লাঠি নিয়ে তাড়া করেন। একবার গোটাকয়েক ডেঁয়ো পিঁপড়ে ওঁর একটুখানি চিনি খেয়ে ফেলেছিল, ভদ্রলোক পিঁপড়েগুলোকে ধরে একটা শিশিতে পুরে রাখলেন আর পর-পর তিন দিন সেই পিঁপড়ে দিয়ে চা করে খেলেন। সেই ভজগৌরাঙ্গ পোলাও-মাংস খাওয়াবেন আমাকে

আর টেনিদাকে ? উঁহু, মাথা খারাপ হলেও এ কথা লোকে ভাবতে পারে না। টেনিদার পেট খারাপই হয়েছে।

টেনিদা বললে, 'অমন সিঙাড়ার মতো মুখ করে, ছাগলের মতো তাকিয়ে আছিস যে ? তাহলে সব খুলে বলি, শোন।

কাল শেষ রাত্তিরে ছোটকাকা সরকারি কাজে এরোপ্লেনে চেপে সিঙাপুরে গেছে। আমি দমদমে ছোটকাকাকে তুলে দিয়ে যখন ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরেছি, তখন রাত চারটে। গলির মধ্যে ঢুকেই দেখি যে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার ! একটা লোক ল্যাম্প-পোস্টের ওপর ঝুলছে, আর নিচ থেকে একজন পাহারাওলা উতারো-উতারো বলে তার ঠ্যাং ধরে টানছে।

এগিয়ে এসে দেখি, ল্যাম্প-পোস্ট ধরে যে লোকটা ঝুলছে সে আর কেউ নয়, ভজগৌরাঙ্গবাবু।

—বল কী ! ভজগৌরাঙ্গবাবু ? তা শেষ রাত্তিরে ল্যাম্প-পোস্ট ধরে ঝুলতে গেল কেন ?

—আরে, সেইটেই তো গণ্ডগোল ! পাহারাওলা তো এক হ্যাঁচকা টানে ভজগৌরাঙ্গবাবুকে চালকুমড়োর মতো ধপাত করে নামিয়ে নিলে। তারপর বললে, তোম্ ইলেকট্রিক তার চুরি করতা হ্যায়—চল থানামে ! আর ভজগৌরাঙ্গ হাউমাউ করতে থাকে, আমি শেষ রাত্রে বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে হিসাব লিখ্‌তা থা, একঠো কাগজ উড়্‌কে ল্যাম্প-পোস্টকে উপরে গিয়ে লটকে গিয়া, সেইঠো পাড়তে গিয়া। পাহারাওলা তা বিশ্বাস করবে কেন ! খালি বলে, তোম্ চোর হ্যায়, চল থানামে !

আমাকে দেখেই ভজগৌরাঙ্গবাবুর সে কী কান্না ! বলে, বাবা টেনি, আমায় বাঁচাও ! এই বুড়ো বয়েসে চোর বলে ধরে নিয়ে গেলে আমি আর বাঁচব না !

যাই হোক, আমি পাহারওলাকে অনেক বোঝালুম। বললুম, 'এ' দারোগা সাব—এ লোক আচ্ছা আদমি, চুরি নেহি করতা। ছোড়্ দিজিয়ে দারোগা সাহেব!—দারোগা সাহেব বলতে লোকটা একটু ভিজল। খানিকটা খইনি-টইনি খেয়ে, ভজগৌরাঙ্গবাবুর টিকিতে একটা টান দিয়ে বললে, আচ্ছাঃ, আজ ছোড়্ দেতা। ফের যদি তোম্ ল্যাম্পপোস্টে ওঠেগা, তো তুম্‌কো ফাঁসি দেগা!—বলে চলে গেল।

তখন ভজগৌরাঙ্গ আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, বাবা টেনি, তুমি আমায় ধনে প্রাণে বাঁচিয়েছ! একথা কাউকে বোলো না—তাহলে পাড়ায় মুখ দেখাতে পারব না! তোমাকে আমি চারটে পয়সা দিচ্ছি, ডালমুট খেয়ো। আমি বললুম, অত শস্তায় হবে না স্যার! যদি আমাকে আর প্যালাকে কাল সন্ধেয় পোলাও-মাংস খাওয়াতে পারেন, তবেই ব্যাপারটা চেপে যাব।

শুনে বুড়োর চোখ কপালে চড়ে গেল। বলে, এই গরমে পোলাও-মাংস খেতে নেই বাবা—শেষে অসুখ করে পড়বে। তার-চে' বরং দু-আনা পয়সা দিচ্ছি—তুমি আর প্যালারাম বোঁদে কিংবা গুঁজিয়া কিনে খেখো। পাকৌড়িও খেতে পার।

আমি বললুম, এই আশ্বিন মাসে মোটেই গরম নেই—ওসব বাজে কথা চলবে না। জেলের হাত থেকে বাঁচালুম, একশো দু-শো টাকা ফাইনও হতে পারত, তার বদলে কিনা বোঁদে আর পাকৌড়ি! বেশ, কিছু খাওয়াতে হবে না আপনাকে। সকাল হতেই আমি আর প্যালা দুটো চোঙা মুখে নিয়ে রাস্তায় বেরুব। আমি বলব—'পটলডাঙার ভজগৌরাঙ্গ', প্যালা বলবে—'তার-চোর!' আমি বলব—'পুলিশ ধরে কাকে?' প্যালা বলবে—

'ভজগৌরাঙ্গকে'! ব্যাস্, বুড়ো একদম ঠাণ্ডা! সুড়-সুড় করে রাজি হয়ে গেল। বুঝলি প্যালা, একেই বলে পলিটিক্স্!

—তাহলে আজ সন্ধেয় আমরা পোলাও-কালিয়া খাচ্ছি? ভজগৌরাঙ্গের বাড়িতে?

—নিশ্চয়! ঠেকাচ্ছে কে?

এবারে সত্যি-সত্যিই আমি নেচে উঠলুম। চেঁচিয়ে বললুম: ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—

টেনিদা বললে: ইয়াক্—ইয়াক্!

সন্ধের পরে ভজগৌরাঙ্গের বাড়ি গিয়ে তো সমানে কড়া নাড়ছি দুজনে। পুরো পনেরো মিনিট কড়া নাড়বার পরেও কোনও সাড়াশব্দ নেই। বুড়ো চুপ্ করে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে ভেতরে। সারারাত কড়া নাড়লেও দরজা খুলবে বলে মনে হল না।

আমি বললুম, হল তো? খাও এখন পোলাও-কালিয়া! পিঁপড়ে দিয়ে চা খায়—ওর কথায় তুমি বিশ্বাস করলে?

টেনিদা ক্ষেপে গেল। খাড়া নাকটাকে গণ্ডারের মতো উঁচু করে বললে, দরজা খুলবে না? দাঁড়া খোলাচ্ছি! আমি বলছি—'ভজগৌরাঙ্গ'—তুই সঙ্গে সঙ্গে বলবি—

—মনে আছে। হাঁক পাড়ো—

টেনিদা যেই আকাশ-ফাটা চিৎকার তুলেছে—'ভজগৌরাজ', আর আমি কাঁসরের মতো ক্যানকেনে গলায় জবাব দিয়েছি—'তার-চোর',—অমনি চিচিং ফাঁক! ক্যাঁচ্ করে দরজা খুলে গেল। একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে ভজগৌরাঙ্গ বেরিয়ে এলেন স্যুট্ করে।

—আহা-হা, করছ কী! চুপ—চুপ!

—চুপ—চুপ মানে? আধ ঘণ্টা ধরে কড়া নাড়ছি—কোন সাড়াই নেই? ভেবেছেন কী আপনি? প্যালা—এগেইন!—

ভজগৌরাঙ্গ তাড়াতাড়ি বললেন, না—না—এগেইন নয়! আহা-হা, বড় কষ্ট হয়েছে তো তোমাদের! আমি কড়ার আওয়াজ শুনতেই পাইনি। মানে—এই পেট-ব্যথা করছিল কিনা, তাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এস—এস—ভেতরে এস—

বারান্দায় একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা, তার একপাশে কতকগুলো হিসেবের কাগজপত্র। একটা লণ্ঠন মিট্-মিট্ করে জ্বলছে। বাড়িতে ইলেকট্রিকের লাইন নিয়ে পয়সা খরচ করবেন, এমন পাত্রই নন ভজগৌরাঙ্গ। কাগজপত্রগুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন: বস, বাবা, বস জিরোও আগে।

টেনিদা বললে: জিরোবার দরকার নেই, দোরগোড়ায় আধ-ঘণ্টা জিরিয়েছি আমরা। পোলাও-কালিয়া কোথায় তাই বলুন।

—পোলাও-কালিয়া?—ভজগৌরাঙ্গবাবু খাবি খেলেন।

—হুঁ, পোলাও-কালিয়া!—টেনিদা বাঘাটে গলায় বললে: সেইরকমই কথা ছিল। কোথায় সে?

ভজগৌরাঙ্গ বললেন: এঃ, তাই তো—একেবারে মনেই ছিল না! মানে সারা দিন খুব পেটের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলুম কিনা, সেইজন্যেই—তা ইয়ে, তোমাদের বরং চার আনা পয়সা দিচ্ছি। শেয়ালদায় পাঞ্জাবীদের দোকানে গিয়ে দু-আনার মাংস আর দু-আনার পুরী—

আমি বললুম: দু-আনায় মাংস দেয় না, চিবুনো হাড় দিতে পারে এক টুকরো।

টেনিদা গর্জন করে বললে ঃ চালাকি ? ফাঁকি দেবার মতলব করেছেন ? জেল থেকে বাঁচিয়ে দিলুম—তার এই প্রতিদান ? যাক, আমরা কিচ্ছু খেতে চাই না। প্যালা—আয় এখুনি বেরিয়ে পড়ি চোঙা নিয়ে !

—আহা-হা চোঙা আবার কেন ?—ভজগৌরাঙ্গ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ঃ চোঙা-টোঙা খুব খারাপ জিনিস। ছিঃ বাবা টেনি, চোঙা নিয়ে চ্যাচাতে নেই—ওতে লোকের শান্তিভঙ্গ হয় !

—সে আমরা বুঝব। আমরা চোঙা ফুঁকে আপনাকে শিঙে ফুঁকিয়ে ছাড়ব ! প্যালা—চলে আয়—

—আহা, থাম—থাম !—ভজগোবিন্দ টেনিদার হাত চেপে ধরলেন। তারপর ডিমভাজার মতো করুণ মুখ করে মিহিদানার মতো মিহি গলায় বললেন ঃ নিতান্তই যদি খাবে, তাহলে আমার খাবারটাই খেয়ে যাও। আমি নয় আজ রাতে এক গ্লাস জল খেয়েই শুয়ে থাকব।—বলেই ভজগৌরাঙ্গের দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

—আপনার খাবারটা কী ?—আমার সন্দেহ হল।

—ভাল মাছ আছে আজকে—পুঁটিমাছ ভাজা। সেইসঙ্গে পান্তা ভাত। দশদিন পরে দু-গণ্ডা পয়সা দিয়ে একটুখানি মাছ এনেছিলুম আশা করে, কিন্তু কপালে না থাকলে—! আবার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ভজগৌরাঙ্গের।

শুনে আমার মায়া হচ্ছিল, কিন্তু টেনিদা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল ঃ

—বটে, পুঁটিমাছ ভাজা আর পান্তা ভাত ! ও রাজভোগ আপনিই খান মশাই ! প্যালা, চোঙাদুটো রেডি আছে তো ? চল্ বেরিয়ে পড়ি—

ভজগৌরাঙ্গ কাঁউ-কাঁউ করে কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ খটখট করে বাজের মতো বেজে উঠল দরজার কড়া। সঙ্গে সঙ্গে বিদঘুটে মোটা গলায় কে বললে : ভাজগুড়ুংবাবু হ্যায়—ভাজগুড়ুং বাবু ?

ভজগৌরাঙ্গ থমকে থেমে গেলেন। টেনিদা জিজ্ঞেস করলে : কোন্ হ্যায় ?

আবার সেই মোটা গলা শোনা গেল : হামি লালবাজার থানা থেকে আসছে !

ভজগৌরাঙ্গ ঠক-ঠক করে কেঁপে উটলেন।

—এই সেরেছে ! টিকিটা টেনে দিয়েও পাহারাওলার রাগ যায়নি—নির্ঘাত লালবাজারে গিয়ে নালিশ করেছে—আর পুলিশে আমায় ধরতে এসেছে ! বাবা টেনি, কাল মাংস-পোলাও চপ-কাটলেট সব খাওয়াব ! আমাকে আজ যেমন করে হোক বাঁচাও !

বাইরে থেকে আবার আওয়াজ এল : জল্‌দি দরজা খুলিয়ে দেন—হামি লালবাজারসে আসছে !

—ওকে বলে—ইয়ে তোমরা আমার ভাইপো, আমি তিন মাসের জন্যে দিল্লী গেছি—বলেই ভজগৌরাঙ্গ চট্ করে অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়লেন, তারপরই একেবারে তক্তপোশের তলায়। সেখান থেকে কুকুরের বাচ্চার ডাকের মতো কুঁ-কুঁ করে আওয়াজ উঠতে লাগল। বোঝা গেল, ভজগৌরাঙ্গ প্রাণ-পণে কান্না চাপবার চেষ্টা করছেন।

—ও ভাজগুড়ুং বাবু—দরজা খোলিয়ে—

টেনিদা ফিস-ফিস করে বললে : ব্যাপার সুবিধের নয় রে প্যালা, লালবাজারের পুলিশ কেন আবার ? বুড়োর সঙ্গে আমরাও ফেঁসে যাব নাকি ?

আমি বললুম ঃ আমরা তো কখনও ল্যাম্প-পোস্টে উঠিনি, আমাদের ভয় কিসের ? দরজা খুলে দেখাই যাক।

তক্তপোশের তলায় আবার কুঁ-কুঁ করে আওয়াজ উঠতে লাগল।

টেনিদা দরজা খুলল ভয়ে-ভয়ে। বাইরে খাকি জামা পরা এক পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে—তার হাতে একটা মস্ত বড় হাঁড়ি। আমাদের দেখেই এক প্রকাণ্ড স্যালুট ঠুকল। তারপর একটা চিঠি দিয়ে বললে, চাটার্জি সাহাব দিয়া। হামি সাহাবকো আরদালি আছে।

রাস্তার আলোয় চিঠিটা পড়ে দেখলুম আমরা। কেষ্টনগর থেকে লিখছে রামগোবিন্দ ঃ

'বাবা, পুলিশ অফিসার মিস্টার চ্যাটার্জি আমার বন্ধু। কেষ্টনগরে বেড়াতে এসেছিলেন। ওঁর সঙ্গে তোমার জন্যে এক হাঁড়ি ভাল সরপুরিয়া আর সরভাজা পাঠালুম। ঘরে রেখে পচিয়ো না—খেয়ো। আমি আর মা ভাল আছি। প্রণাম নিয়ো।

—রামগোবিন্দ।

টেনিদা একবার আমার দিকে তাকালো, আমি তাকালুম টেনিদার দিকে। আমি বললুম, আচ্ছা আরদালি সাহেব, সব ঠিক হ্যায়!

'আরদালি সাহেব' আবার স্যালুট করে, জুতো মচ্‌মচিয়ে চলে গেল।

আমি কি বলতে যাচ্ছিলুম, টেনিদা ঝট্‌ করে আমাকে দরজার বাইরে টেনে নিয়ে এল।

—চুপ্‌, স্পীক-টি নট্‌! একহাঁড়ি সরভাজা আর সরপুরিয়া

—খাঁটি কেষ্টনগরের জিনিস! পোলাও-কালিয়া কোথায় লাগে এর কাছে!

দরজাটা টেনে দিতে দিতে টেনিদা হাঁক পাড়ল: ভজগৌরাঙ্গ-বাবু লাইন ক্লিয়ার! পুলিশ তাড়িয়েছি! কাল আর ঘর থেকে বেরুবেন না! পরশু সন্ধ্যায় আমরা পোলাও-কালিয়া খেতে আবার আসব। এখন দরজাটা বন্ধ করে দিন।

তারপর?

তারপর সেই সরভাজা আজ সরপুরিয়ার হাঁড়ি নিয়ে আমরা দু-জন সোজা টেনিদাদের তেতলার ছাদে। টেনিদা একখানা গোটা সরভাজা মুখে দিয়ে বললে: ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টো-ফিলিস—

আমি সরপুরিয়ায় কামড় দিয়ে বললুম: ইয়াক্—ইয়াক্!

তত্ত্বাবধান মানে—জীবে প্রেম !

রবিবারের সকালে ডাক্তার মেজদা কাছাকাছি কোথাও নেই দেখে আমি মেজদার স্টেথিসকোপ কানে লাগিয়ে বাড়ির হুলোবেড়াল টুনির পেট পরীক্ষা করছিলুম। বেশ গুরগুর করে আওয়াজ হচ্ছে, মানে এতদিন ধরে যতগুলো নেংটি ইঁদুর আরশোলা টিকটিকি খেয়েছে তারা ওর পেটের ভেতরে ডাকাডাকি করছে বলে মনে হচ্ছিল। আমি টুনির পেট সম্পর্কে এইসব দারুণ দারুণ চিন্তা করছি, এমন সময় বাইরে থেকে টেনিদা ডাকল ঃ প্যালা, কুইক—কুইক !

স্টেথিসকোপ রেখে একলাফে বেরিয়ে এলুম বাড়ি থেকে।

—কী হয়েছে টেনিদা ?

টেনিদা গম্ভীর হয়ে বললে, পুঁদিচ্চেরি !

মনে কোনরকম উত্তেজনা এলেই টেনিদা ফরাসী ভাষায় কথা বলতে থাকে। তখন কে বলবে, স্রেফ ইংরিজির জন্যেই ওকে তিন-তিনবার স্কুল ফাইন্যালে আটকে যেতে হয়েছে !

আমি বললুম, পুঁদিচ্চেরি মানে ?

—মানে, ব্যাপার অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক। এক্ষুনি তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। ক্যাবলা কিংবা হাবুল সেন কাউকে বাড়িতে পেলুম না—তাই তোকেই নিয়ে যেতে এসেছি।

—কোথায় নিয়ে যাবে ?

—কালীঘাটে।

—কালীঘাটে কেন?—আমি উৎসাহ বোধ করলুম—কোথাও খাওয়া-টাওয়ার ব্যবস্থা আছে বুঝি?

—এটার দিন রাত খালি খাওয়ার চিন্তা!—বলে টেনিদা আমার মাথার দিকে তাক করে চাঁটি তুলল, সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে তিন হাত দূরে ছিটকে গেলুম আমি।

—মারামারি কেন আবার? কী বলতে চাও, খুলেই বলো না।

চাঁটিটা কষতে না পেরে ভীষণ ব্যাজার হয়ে টেনিদা বললে, বলতে আর দিচ্ছিস কোথায়?—সমানে চামচিকের মতো চ্যাক-চ্যাক করছিস তখন থেকে। হয়েছে কী জানিস, আমার পিসতুতো ভাই ভোম্বলদার ফ্ল্যাটটা একটু তত্ত্বাবধান—মানে সুপারভাইজ করে আসতে হবে।

—তোমার ভোম্বলদা কী করছেন? কম্বল গায়ে দিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে আছেন?

—আরে না না! ভোম্বলদা—ভোম্বল বৌদি, মায় ভোম্বলদার মেয়ে ব্যাম্বি—সবাই মিলে ঝাঁসি না গোয়ালিয়র কোথায় বেড়াতে গেছে। আজই সকালে সাড়ে দশটার গাড়িতে ওরা আসবে। এদিকে আমি তো স্রেফ ভুলে মেরে বসে আছি, বাড়ির কী হাল হয়েছে কিচ্ছু জানি না। চল্—দু-জনে মিলে এইবেলা একটু সাফ-টাফ করে রাখি।

শুনে পিত্তি জ্বলে গেল:—আমি তোমার ভোম্বলদার চাকর নাকি যে ঘর ঝাঁট দিতে যাব? তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যাও।

টেনিদা নরম গলায় আমাকে বোঝাতে লাগল তখন:—ছি প্যালা, ওসব বলতে নেই—পাপ হয়। চাকরের কথা কেন বলছিস র‍্যা—এ হল পরোপকার। মানে জীবসেবা। আর

জানিস তো—জীবে প্রেম করার মতো এমন ভাল কাজ আর কিচ্ছুটি নেই ?

আমি মাথা নেড়ে বললুম, তোমার ভোম্বলদাকে প্রেম করে আমার লাভ কী ? তার চেয়ে আমার হুলো বেড়াল টুনিই ভাল। সে ইঁদুর টিঁদুর মারে।

টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কলেজে ভর্তি হয়ে তুই আজকাল ভারি পাখোয়াজ হয়ে গেছিস—ভারি ডাঁট হয়েছে তোর! আচ্ছা চল্ আমার সঙ্গে—বিকেলে তোকে চাচার হোটেলে কাটলেট খাওয়াব।

—সত্যি ?

—তিন সত্যি। কালীঘাটের মা কালীর দিব্যি।

এরপরে জীবকে—মানে ভোম্বলদাকে প্রেম না করে আর থাকা যায় ? দারুণ উৎসাহের সঙ্গে আমি বললুম, আচ্ছা চল তাহলে।

বাড়িটা কালীঘাট পার্কের কাছেই। তেতলার ফ্ল্যাটে ভোম্বলদা থাকেন, ভোম্বল-বৌদি থাকেন, আর তিন বছরের মেয়ে ব্যাম্বি থাকে।

টেনিদা চাবি খুলতে যাচ্ছিল, আমি হাঁ-হাঁ করে বাধা দিলুম।

—আরে আরে, কার ঘর খুলছ ? দেখছ না—নেম-প্লেট রয়েছে অলকেশ ব্যানার্জি এম্. এস্-সি ?

—ভোম্বলদার ভাল নামই তো অলকেশ।

শুনেই মন খারাপ হয়ে গেল। এমন নামটাই বরবাদ ? ভোম্বলদার পোশাকী নাম দোলগোবিন্দ হওয়া উচিত। ভূতেশ্বর হতেও বাধা নেই, এমনকি করালীচরণও হতে পারে। কিন্তু

অলকেশ একেবারেই বেমানান—আর অলকেশ হলে কিছুতেই ভোম্বলদা হওয়া উচিত নয়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব ভাবছি আর নাক চুলকোচ্ছি, হঠাৎ টেনিদা হাঁক ছাড়ল।

—ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি হাঁ করে? ভেতরে আয়।

ঢুকে পড়লুম ভেতরে।

গোছাবার সাজাবার কিছু নেই—সবই ভোম্বল-বৌদি বেশ পরিপাটি করে রেখে গেছেন। দিব্যি বসবার ঘরটি—আমি আরাম করে একটা সোফার ওপর বসে পড়লুম।

—এই, বসলি যে?

—কী করব, করবার তো কিছুই নেই।

—তা বটে। টেনিদা হতাশ হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখল একবার,—ধূলো-টুলোও তো বিশেষ পড়েনি দেখছি।

—বন্ধ ঘরে ধুলো আসবে কোত্থেকে?

—হুঁ, তাই দেখছি। কিছুক্ষণ নাক-টাক চুলকে টেনিদা বললে, কোন উপকার না করে চলে গেলে মনটা যে বড্ড হু-হু করবে র‍্যা! আচ্ছা—একটা কাজ করলে হয় না? ঘরে ধুলো না থাকলেও মেঝের ঐ কার্পেটটায় নিশ্চয় আছে। আর ধুলো থাকবে না অথচ কার্পেট থাকবে—এ কখনো হতেই পারে না এমন কোনদিন হয়নি। আয়—বরং এটাকে—

কার্পেট ঝাড়বার প্রস্তাবটা আমার একেবারেই ভাল লাগল না। আপত্তি করে বললুম, কার্পেট নিয়ে আবার টানাটানি কেন? ও যেমন আছে তেমনি থাক না। খামোকা—

—শাট আপ! কাজ করবি নে তো মিথ্যেই ট্রাম ভাড়া

দিয়ে তোকে কালীঘাটে নিয়ে এলুম নাকি? সোফায় বসে আর নবাবি করতে হবে না প্যালা, নেমে আয় বলছি—

অগত্যা নামতে হল, সোফা আর টেবিল সরাতে হল, কার্পেট টেনে তুলতে হল, তারপর একবার—মাত্র একটি বার ঝাড়া দিতেই—ডি লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস!

ঘরের ভেতরে যেন ঘুর্নি উঠল একটা! চোখের পলকে সব অন্ধকার!

টালা থেকে ট্যাংরা আর শেয়ালদা থেকে শিয়াখালা পর্যন্ত যত ধুলো ছিল একসঙ্গে পাক খেয়ে উঠল।—সেরেছে, সেরেছে, বলে এক বাঘা চিৎকার দিলুম আমি, তারপর দু-লাফে আমরা বেরিয়ে পড়লুম ঘর থেকে—নাকে ধুলো, কানে ধুলো, মুখে ধুলো, মাথায় ধুলো। পুরো দশটি মিনিট খক-খক খকাখক করে কাশির প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে আবার কোত্থেকে গোটা-দুই আরশোলা আমার নাকের ওপর ডিগবাজি খেয়েও গেল।

কাশি বন্ধ হলে মাথা-টাথা ঝেড়ে, মুখ-ভর্তি কিচ্‌কিচে বালি নিয়ে আমি বললুম, এটা কী হল টেনিদা?

টেনিদা গাঁক-গাঁক করে বললে, হুঁ! কেমন বেয়াড়া হয়ে গেল রে! মানে এত ধুলো যে ওর ভেতরে থাকতে পারে—বোঝাই যায় নি! ইস্—ঘরটার অবস্থা দেখছিস?

হ্যাঁ—দেখবার মতো চেহারাই হয়েছে এবার! দরজা দিয়ে তখনো ধোঁয়ার মতো ধুলো বেরুচ্ছে—সোফা, টেবিল, টিপয়, বুক-কেস, রেডিয়ো—সবকিছুর ওপর নীট তিন ইঞ্চি ধুলোর আস্তর! ভোম্বল-বৌদি ঘরে পা দিয়েই স্রেফ অজ্ঞান হয়ে পড়বেন।

দু-হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে টেনিদা বললে, ইঃ—একেবারে নাইয়ে দিয়েছে রে!

আমি বললুম, ভালই তো হল। কাজ করতে চাইছিলে, কর এবার প্রাণ খুলে! সারা দিন ধরেই ঝাঁট দিতে থাকো!

দাঁত খিচোতে গিয়েই বালির কিচ্‌কিচানিতে টেনিদা খপাৎ করে মুখ বন্ধ করে ফেলল।

—তা ঝাঁট তো দিতেই হবে! বাড়িতে এসে এই দশা দেখবে নাকি ভোম্বলদা? আয়—

—আবার কার্পেট!

—নিকুচি করেছে কার্পেটের! চল্—ঝাঁটা খুঁজে বের করি।

ঝাঁটা আর পাওয়া যায় না। বসবার ঘরে নয়—শোবার ঘরে নয়, শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরে এসে হাজির হলুম আমরা।

—আরে ঐ তো ঝাঁটা!

তার আগেই জাল-দেওয়া মীট-সেফের দিকে নজর পড়েছে আমার।

—টেনিদা!

—কী হল আবার?—টেনিদা খ্যাক-খ্যাক করে বললে, সারা ঘর ধুলোয় একাকার হয়ে রয়েছে—এখন আবার ডাকাডাকি কেন? আয় শিগ্‌গির—একটু পরেই তো ওরা এসে পড়বে!

আমি বলছিলুম কি—কানদুটো একবার চুলকে নিয়ে জবাব দিলুম: মীট-সেফের ভেতর যেন গোটা-তিনেক ডিম দেখা যাচ্ছে!

—তাতে কী হল?

—একটা মাখনের টিনও দেখতে পাচ্ছি।

টেনিদার মনোযোগ আকৃষ্ট হল।

—আচ্ছা বলে যা।

—দুটো কেরেসিন স্টোভ দেখতে পাচ্ছি—দু-বোতল তেল দেখা যাচ্ছে—ওখানে শেলফের ওপর একটা দেশলাইও যেন চোখে পড়ছে।

—হুঁ, তারপর ?

আমি ওয়াশ-বেসিনটা খুললুম।

—এতেও জল আছে—দেখতে পাচ্ছ তো ?

—সবই দেখতে পাচ্ছি। তারপর ?

আমি আর একবার বাঁ কানটা চুলকে নিলুম : মানে সামনে এখন অনেক কাজ—যাকে বলে দুরূহ কর্তব্য ! ঘর থেকে ঐ মণখানেক ধুলো ঝেঁটিয়ে বের করতে ঘণ্টাখানেক তো মেহনত করতে হবে অন্তত ? আমি বলছিলুম কি, তার আগে একটু কিছু খেয়ে নিলে হয় না ? ধর তিনটে ডিম দিয়ে বেশ বড়-বড় দুটো ওমলেট হতে পারে—

—ব্যাস-ব্যাস, আর বলতে হবে না। টেনিদার জিভ থেকে সড়াক করে একটা আওয়াজ বেরুল : এটা মন্দ বলিসনি। পেট খুশি থাকলে মেজাজটাও খুশি থাকে।—আর এই যে একটা বিস্কুটের টিনও দেখতে পাচ্ছি—

পত্রপাঠ টিনটা টেনে নামালো টেনিদা, কিন্তু খুলেই মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মতো করে বললে, ধেৎ !

—কী হল, বিস্কুট নেই ?

—নাঃ, কতগুলো ডালের বড়ি। ছ্যা-ছ্যা !—টেনিদা ব্যাজার হয়ে বললে, জানিস, ভোম্বল-বৌদি এম. এ. পাশ, অথচ বিস্কুটের টিনে বড়ি রাখে। রামোঃ !

আমি বললুম, তাতে কী হয়েছে ? আমার এলাহাবাদের

সোনাদিও তো কি-সব থিসিস লিখে ডাক্তার হয়েছে—সেও তে ডালের বড়ি খেতে খুব ভালবাসে!

—রেখে দে তোর সোনাদি!—টেনিদা ঠক্ করে বড়ির টিনটাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে বললে, বলি, মতলব কী তোর? খালি তক্কোই করবি আমার সঙ্গে, না ওমলেট-টোমলেট ভাজবি?

—আচ্ছা, এস তাহলে, লেগে পড়া যাক।

লেগে যেতে দেরি হল না। সস্‌প্যান বেরুল, ডিম বেরুল, চামচে বেরুল, লবণ বেরুল, লঙ্কার গুঁড়োও পাওয়া গেল খানিকটা। শুধু গোটা-দুই পেঁয়াজ পাওয়া গেলেই আর দুঃখ থাকত না কোথাও।

টেনিদা বললে, ডি লা গ্র্যাণ্ডি! আরে, ওতেই হবে। তুই ডিম তিনটে ফেটিয়ে ভ্যাল্—আমি স্টোভ ধরাচ্ছি ততক্ষণে।

ওমলেট বরাবর খেয়েই এসেছি, কিন্তু কী করে ফোটাতে হয় সেটা কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। নাকি, ফেটাতে বলছে? তা হলে তো তা দিতে হয়। কিন্তু তা দিতে থাকলে ও কি আর ডিম থাকবে? তখন তো বাচ্চা বেরিয়ে আসবে। আর বাচ্চা বেরিয়ে এলে আর ওমলেট খাওয়া যাবে না—তখন চিকেন কারি রান্না করতে হবে। আর তাহলে—

টেনিদা বললে, অমন টিকটিকির মতো মুখ করে বসে আছিস কেন র‍্যা? তোকে ডিম ফেটাতে বললুম না?

—ফেটাতে বলছ? মানে, ফাটাতে হবে? নাকি ফোটাতে বলছ? ফোটাতে আমি পারব না সাফ বলে দিচ্ছি তোমাকে।

—কী জ্বালা!—টেনিদা খেঁকিয়ে উঠল: কোন কাজের নয় এই হতচ্ছাড়াটা—খালি খেতেই জানে! ডিম কী করে ফেটাতে হয় তাও বলে দিতে হবে?

একটু ভেঙে নে—তারপর পেয়ালায় ঢেলে চামচ দিয়ে বেশ করে নাড়তে থাক্। বুঝেছিস ?

আরে তাই তো! এতক্ষণে মালুম হল আমার। আমাদের পটলডাঙার 'দি গ্রেট আবার-খাবো রেস্তোরাঁ'র বয় কেষ্টাকে অনেকবার কাঁচের গেলাসে ডিমের গোলা মেশাতে দেখছি বটে।

পয়লা ডিমটা ভাঙতেই একটা বিচ্ছিরি বদ গন্ধে সারা ঘর ভরে উঠল। দোসরা ডিম থেকেও সেই খোশবু।

নাক টিপে ধরে বললুম, টেনিদা—যাচ্ছেতাই গন্ধ বেরুচ্ছে কিন্তু ডিম থেকে!

টেনিদা স্টোভে তেল ভরতে-ভরতে বললে, ডিম থেকে কবে আবার গোলাপ ফুলের গন্ধ বেরোয় ? নাকি ডিম ভাঙলে তা থেকে হালুয়ার সুবাস বেরুবে ? নে—নিজের কাজ করে যা।

—পচা বলে মনে হচ্ছে আমার।

—তোর মাথার ঘিলুগুলোই পচে গেছে—টেনিদা চটে বললে, একটা ভাল কাজের গোড়াতেই তুই বাগড়া দিবি! নে—হাত চালা। তোর ইচ্ছে না হয় খাস নি—আমি যা পারি ম্যানেজ করে নেব।

—করো, তুমিই করো তবে—বলে যেই তেস্‌রা নম্বর ডিম মেজেতে ঠুকেছি—

গল্‌-গল্ করে মেঝে থেকে যে বস্তু বেরিয়ে এল, তার যে কী নাম দেব তা আমি আজও জানি না। আর গন্ধ ? মনে হল দুনিয়ার সমস্ত বিকট বদ গন্ধকে কে যেন ওর মধ্যে ঠেসে রেখেছিল—একেবারে বোমার মতো ফেটে বেরিয়ে এল তারা! মনে হল, এক্ষুনি আমার দম আটকে যাবে!

—গেছি—গেছি—বলে আমি একদম ঠিকরে পড়লুম

বাইরে। সেই দুর্ধর্ষ মারাত্মক গন্ধের ধাক্কায় বোঁ করে যেন মাথাটা ঘুরে গেল, আর আমি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লুম শিবনেত্র হয়ে।

—উরে ব্বাঁপ—ইঁ কীঁ গন্ধ র‍্যা !—টেনিদার একটা আর্তনাদ শোনা গেল। তারপর—

এবং তার পরেই—

টেনিদাও খুব সম্ভব একটা লাফ মেরেছিল। এবং পেল্লায় লাফ। পায়ের ধাক্কায় জ্বলন্ত কেরোসিন স্টোভটা তেল ছড়াতে ছড়াতে বলের মতো গড়িয়ে এল—সোজা গিয়ে হাজির হল ভোম্বলদার শোবার ঘরের দরজার সামনে। আর ভোম্বল-বৌদির সাধের সম্বলপুরী পর্দা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল তৎক্ষণাৎ।

টেনিদা বললে, আগুন—আগুন—ফায়ার ব্রিগেড—বসবার ঘরে টেলিফোন আছে প্যালা—দৌড়ে যা—জিরো ডায়েল—ফায়ার ব্রিগেড—

ঊর্ধ্বশ্বাসে ফোন করতে ঢুকেছি, সেই স্তূপাকার কার্পেটে পা আটকে গেল। হাতে টেলিফোনও তুলেছিলুম, সেইটে শুদ্ধুই ধপাস্ করে রাম-আছাড় খেলুম একটা। ক্র্যাং—কড়াৎ করে আওয়াজ উঠল। টেলিফোনের মাউথ-পীসটা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দু-টুকরো। যাক, নিশ্চিন্দি! ফায়ার ব্রিগেডকে আর ডাকতে হল না।

উঠে বসবার আগেই ঝপাস্—ঝপাস্!

টেনিদা দৌড়ে বাথরুমে ঢুকেছে, আর দু-বালতি পনেরো দিনের পচা জল চৌবাচ্চা থেকে তুলে এনে ছুড়ে দিলে সম্বলপুরী পর্দার ওপর। আধখানা পর্দা পুড়িয়ে আগুন নিভেছে, কিন্তু শোবার ঘরে জলের ঢেউ খেলছে—বিছানা-পত্র ভিজে একাকার,

খানিকটা জল চল্‌কে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলটাকেও সাফ-সুফ করে দিয়েছে।

নিজেদের কীর্তির দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম আমরা। বাড়ি-ভর্তি পচা ডিম আর পোড়া কাপড়ের গন্ধ—বসবার ঘরে দু-ইঞ্চি ধুলোর আস্তর—শোবার ঘর আর বারান্দা জলে থই-থই—আধ-পোড়া পর্দাটা থেকে জল চুইয়ে পড়ছে, টেলিফোনটা ভেঙে চুরমার।

একেই বলে বাড়ি সুপারভাইজ করা—এর নামই জীবে প্রেম।

ঠিক তখনই নিচ থেকে ট্যাক্সির হর্ন বেজে উঠল—ভ্যাঁ—ভ্যাঁ-প্‌!

টেনিদা নড়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে মাথা সাফ হয়ে গেছে ওর। চিরকালই দেখে আসছি এটা।

—প্যালা, কুইক!

কিসের কুইক সে কথাও কি বলতে হবে আর? আমিও পটলডাঙার ছেলে—ট্যাক্সির হর্ন শুনেই বুঝতে পেরেছি সব। সিঁড়ি দিয়ে তো নামলুম না—যেন উড়ে পড়লুম রাস্তায়।

ট্যাক্সি থেকে ভোম্বলদা নামছেন, ভোম্বল-বৌদি নামছেন, ভোম্বলদার ছোকরা চাকর জলধরের কোলে ব্যাম্বি নামছে।

আমাদের দেখেই ভোম্বলদা চেঁচিয়ে উঠলেন—কিরে টেমি, বাড়িঘর সব—

—সব ঠিক আছে ভোম্বলদা—একেবারে ছবির মতো সাজিয়ে দিয়ে এসেছি!—বলেই টেনিদা চাবির গোছাটা ছুড়ে দিলে ভোম্বলদার দিকে। তারপর হতভম্ব ভোম্বলদা একটা কথা বলবার আগেই দু-জনে দু-লাফে একটা দু-নম্বর চলতি বাসের ওপর।

আর দাঁড়ানো চলে এরপর? এক সেকেণ্ডও?

আপাতত গভীর অরণ্যে ধ্যানে বসে আছি। বেশ দম নিয়েই ধ্যান করছি। শুধু কতগুলো পোকা উড়ে উড়ে ক্রমাগত নাকে মুখে এসে পড়ছে আর এমন বিশ্রী লাগছে যে কী বলব! নাকে ঢুকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, কানের ভেতরে ঢুকে ওই গভীর গহ্বরটার ভেতরে কোন জটিল রহস্য আছে কি না সেটাও বোঝবার চেষ্টা করছে। একবার ঢোক গিলতে গিয়ে ডজনখানেক খেয়ে ফেলেছি। খেতে বেশ মৌরি মৌরি লাগল—কিন্তু যা বিকট গন্ধ। বমি করতে পারতাম, কিন্তু ধ্যান করতে বসলে তো আর বমি করা যায় না! তাড়াব সে উপায়ও নেই, কারণ এখন আমি সমাধিস্থ—একেবারে নিবাত-নিষ্কম্প হয়েই থাকতে হবে আমাকে।

আমি গোড়াতেই বুঝেছিলাম এরকম হবে! হাবুলকেও বলেছিলাম কথাটা। কিন্তু সে তখন ইন্দ্রত্ব লাভ করে কৈলাসে শিবের কাছে যাওয়ার কথা ভাবছে, আমলই দিলে না। বললে, যাঃ, যাঃ, এখন ওসব ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করিস নি। অরণ্যে পোকা থাকেই এবং নাকে মুখেও তারা পড়ে। চুপচাপ বরদাস্ত করে যা—নইলে মহর্ষি হবি কেমন করে?

তা বটে। তবে একটা জিনিস বুঝেছি, মহর্ষিদের মেজাজ অমন ভীমরুলের চাকের মতো কেন, আর কথায় কথায়ই তাঁরা অমন তেড়ে ব্রহ্মশাপ ঝাড়েন কেন! আরে বাপু, ধৈর্যের একটা সীমা তো আছে মানুষের! নাকে মুখে অমন পোকার উপদ্রব

হলে শান্তনুর মতো শান্ত মানুষও যে দুর্বাসা হতে বাধ্য এ ব্যাপারে আমার আর তিলমাত্রও সন্দেহ নেই।

আচ্ছা জ্বালাতনেই পড়া গেল বাস্তবিক। সত্যি বলছি, আমি প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে, পালাজ্বরে ভুগি আর বাসকপাতার রস খাই, আমার কী দায়টা পড়েছে মহর্ষি-টহর্ষির মতো গোলমেলে ব্যাপারে পা বাড়িয়ে? পটলডাঙার গলিতে থাকি, পটল দিয়ে শিংমাছের ঝোল আর আতপ চালের ভাত আমার বরাদ্দ, এক-মুঠো চানাচুর খেয়েছি কি পেটের গোলমালে আমার পটল তোলবার জো! এ-হেন আমি—একেবারে গোরুর মতো বেচারা লোক—আমিই শেষে পড়ে গেলাম ছ-হাত লম্বা আর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুক-ওলা টেনিদার পাল্লায়।

আর টেনিদার পাল্লায় পড়া মানে যে কী, যারা পড়ো নি—উহু, ভাবতেই পারবে না। গড়ের মাঠের গোরা থেকে চোরা-বাজারের চালিয়াৎ দোকানদার পর্যন্ত ঠেঙিয়ে একেবারে রপ্ত। হাত তুললেই মনে হবে রদ্দা মারলে, দাঁত বার করলেই বোধ হবে কামড়ে দিলে বোধহয়। এই ভৈরব ভয়ঙ্কর লোকের খপ্পরে পড়েই আমাকে এমন মহর্ষি হয়ে ধ্যান করতে হচ্ছে।

কী আর করি! বসে আছি তো বসেই আছি। অরণ্যের ভেতরে একটা ফুটো—সেখান দিয়ে দেখছি হতভাগা হাবুলের নাক বেরিয়ে আছে। পোকার কামড়ে জেরবার হয়ে ভাবছি ওই নাকেই একটা ধাঁ করে ঘুসি বসাব কি না, এমন সময় শিষ্য দধি-মুখের প্রবেশ।

দধিমুখ বললে, প্রভু, আছে নিবেদন।

বললাম, কহ বৎস, শুনিব নিশ্চয়।

দধিমুখ বললে,　　কালি নিশিশেষে
দেখিলাম আশ্চর্য স্বপন।
দেখিলাম, প্রভু যেন দেবদেহ ধরি,
আরোহিয়া অগ্নিময় রথে,
চলেছেন মহাব্যোমে ছায়া-পথ করি বিদারণ !
সত্রাসে কহিনু কাঁদি—
ওয়াক্—ওয়াক্ থুঃ !

আর কী, পোকা ! থু-থু করে দধিমুখ সেটা আমার গায়েই ঝেড়ে দিলে, শিষ্যের আস্পর্দাখানা দেখো একবার ! রাগে আমার শরীর জ্বলে গেল,—টিকি খাড়া হয়ে উঠে ব্রহ্মতেজে। কিন্তু শিষ্যকে শাপ দিলেই তো সব মাটি। মনে মনে ভাবলাম, দাঁড়াও চাঁদ, তোমাকে সায়েস্তা করতে হচ্ছে !

হেসে বললাম,　　আছে, আছে রহস্য অদ্ভুত !
নিরেট মগজ তব সহজে তো বুঝিবে না সেটা,
কাছে এসো কহি কানে কানে।

দধিমুখ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আমার মুখ থেকে যা আশা করছিল তা শুনতে পায় নি—কী যে করবে ঠিক বুঝতে পারছে না ! দধিমুখ অসহায়ভাবে একবার চারদিকে তাকাল।

আমি বললাম,　　দাঁড়াইয়া কেন ?
কাছে এসো, মুখ আনো কানের নিকটে,
তবে তো জানিবে সেই অদ্ভুত বারতা।
এসো বৎস—
বালক, আরো কাছে আয়—কাছে আয় না—

দধিমুখের বয়স অল্প—একেবারে আনাড়ি। ইতস্তত করে যেই আমার কানের কাছে মুখ আনা, অমনি আমি পালটা জবাব

দিলাম। মস্ত একটা হাঁ করলাম, সঙ্গে সঙ্গেই একঝাঁক পোকা পড়ল মুখের ভেতর। আর পত্রপাঠ সেগুলো থু-থু শব্দে ফেরত গেল দধিমুখে গালে, নাকে, মুখে, কপালে। শিষ্যকে গুরুর স্নেহাশিস।

দধিমুখ অ্যাঁ-অ্যাঁ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়াং করে ড্রপ সীন। খট্ করে বাঁশটা আমার নাকে পড়ল, তারপর সোজা নিচে। সীন শেষ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তক্ষুনি স্টেজের ভেতর ছুটে এল ইন্দ্রবেশী হাবুল আর বিশ্বকর্মা-বেশী টেনিদা। টেনিদা বললে, এটা কী হল—অ্যাঁ? এর মানেটা কী, শুনি?

আমি বিদ্রোহ করে বললাম, কিসের মানে?

টেনিদা দাঁত খিচিয়ে উঠল ঃ প্লে-টা তুই মাটি করবি হতভাগা! কেন ওভাবে থুথু দিলি ক্যাবলার মুখে? একদম বরবাদ হয়ে গেল সীনটা! কী রকম হাসছে অডিয়েন্স—তা দেখছিস?

আমি বললাম, ক্যাবলাই তো থুথু দিয়েছে আগে।

টেনিদা বললে, হুম্! দুটোর মাথাই একসঙ্গে ঠুকে দেব এক-জোড়া বেলের মতো! যাক, যা হয়ে গেছে সে তো গেছেই। এখন পরের সীনগুলোকে ভাল করে ম্যানেজ করা চাই—বুঝলি? যদি একটু বেয়াড়াপনা করিস তো একটা চাঁটির চোটে নাক একেবারে নাসিকে পাঠিবে দেব!

আমি বললাম, তুমি তো বলেই খালাস। কিন্তু স্টেজে হাঁ করে বসে ওই পোকা হজম করবে কে, সেটা শুনি?

টেনিদা হুঙ্কার করল, তুই করবি। আলবাত, তোকেই করতে

হবে। থিয়েটার করতে পারবি আর পোকা খেতে পারবি না? দরকার হলে মশা খেতে হবে, মাছি খেতে হবে—

হাবুল যোগ দিয়ে বললে, ইঁদুর খেতে হবে, বাদুড় খেতে হবে—

টেনিদা বললে, মাদুর খেতে হবে, এমন কি খাট-পালং খাওয়াও আশ্চর্য নয়। হুঁ-হুঁ বাবা, এর নাম থিয়েটার!

—থিয়েটার করতে গেলে ওসব খেতে হয় নাকি?—আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালাম।

—হয়, হয়। তুই এসবের কি বুঝিস র‍্যা—অ্যাঁ? দানীবাবুর নাম শুনেছিস, দানীবাবু? তিনি যখন সীতার ভূমিকায় প্লে করতেন তখন মনুমেণ্ট খেয়ে নামতেন, সেটা জানিস?

—মনুমেণ্ট খেয়ে!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনুমেণ্ট খেয়ে। যাঃ—যাঃ ক্যাঁচ্ম্যাচ্ করিস নি! এক্ষুনি সীন উঠবে—কেটে পড়্—নিজের পার্ট মুখস্থ করগে।

বেগুন-ক্ষেতে কাক-তাড়ানো কেলে হাঁড়ির মতো মুখ করে আমি স্টেজের একধারে এসে বসলাম। মনুমেণ্ট খাওয়া! চালিয়াতির আর জায়গা পাও নি—মানুষে কখনো মনুমেণ্ট খেতে পারে! কিন্তু প্রতিবাদ করলেই চাঁটি, তাই অমন বোম্বাই চালখানাও হজম করে গেছি।

থিয়েটার করতে এলেই পোকা খেতে হবে! কেন রে বাপু, তোমাদের সঙ্গে থিয়েটার না করতে পারলে তো আমার আর শিঙি মাছের ঝোল হজম হচ্ছিল না কিনা! আমি প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে, আমার পেটজোড়া পিলে—দায় পড়েছিল আমার এক-মুখ কুট্কুটে দাড়ি নিয়ে দধীচি সাজতে! যত সব জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে পড়ে এখন আমার এই হাড়ির হাল!

দিব্যি বসে ছিলাম চাটুজ্জেদের রোয়াকে—ওরা উঠোনে হাত-পা নেড়ে রিহার্সেল দিচ্ছিল। কিন্তু দধীচি সাজবার ছেলে প্যাওয়া যাচ্ছিল না। টেনিদা তার ভাঁটার মতো চোখ পাকিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এসে খপ্ করে আমার কাঁধটা ধরে ফেলল ঃ অ্যাই পাওয়া গেছে!

আমি বললাম, অ্যাঁ—অ্যাঁ—

টেনিদা বাঘাটে গলায় বললে, অ্যাঁ-অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ-হ্যাঁ। দিব্যি মুনি-ঋষির মতো চেহারা তোর, বেশ অহিংস ছাগল-ছাগল ভাব। গালে ছাগলের মতো দাড়ি লাগিয়ে দেব,—যা মানাবে, আঃ! দেখাবে একেবারে রায়বাড়ির কেশো-বুড়োটার মতো!

আপাতত এই তার পরিণতি।

এ অঙ্কে আমার পার্ট নেই, তাই স্টেজের অন্ধকারে একটা কোণায় ঝিম্ মেরে বসে আছি। দাড়িটা হাতে খুলে নিয়েছি, আর মশা তাড়াচ্ছি প্রাণপণে। নাঃ—এ অসম্ভব! আবার স্টেজে গেলেই ধ্যানে বসতে হবে এবং ধ্যানে বসা মানেই পোকা। আর কী মারাত্মক সে পোকা!

কী করা যায়?

রাগে হাড়-পিত্তি জ্বলছে! দয়া করে পার্ট করছি এই ঢের তার ওপর আবার অপমান! এমন করে শাসানো! চাঁটি হাঁকড়ে নাক নাসিকে উড়িয়ে দেবে! ইস্, শখখানা দেখ একবার। না হয় তোমার আছেই পিরামিডের মতো উঁচু একটা অতিকায় নাক, আর আমার নাকটা না-হয় চীনম্যানদের মতো থ্যাবড়া, তাই বলে নাক নিয়ে অপমান! আচ্ছা, দাঁড়াও, দাঁড়াও! এই খাঁদা নাককেই—মৈনাকের মতো উঁচু করে তোমার ভরাডুবি করে ছাড়ব!

কিন্তু কী করা যায় বাস্তবিক ?

ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না, ওদিকে স্টেজে তখন দারুণ বক্তৃতা দিচ্ছে টেনিদা, এমন এক-একটা লাফ মারছে যে চাটুজ্জেদের ছারপোকাভরা পুরনো তক্তাপোশটা একেবারে মড়্-মড়্ করে উঠছে। থিয়েটার করছে না হাই-জাম্প দিচ্ছে বোঝা মুশকিল।

স্টেজ-মানেজার হাবুল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বললে, এই প্যালা, অমন ভূতের মতো অন্ধকারে বসে আছিস যে ?

বললাম, একটু চা খাওয়া না ভাই হাবুল, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে !

হাবুল নাকটা কুঁচকে বললে, নেঃ নেঃ, অত চা খায় না ! যা পার্ট করছিস, আবার চা !

অ্যাডিং ইনসাল্ট্ টু ইনজুরি—অ্যাঁ ! আমি অন্ধকারে দাঁত বের করে হাবুলকে ভেংচে দিলাম, হাবুল দেখতে পেলে না।

চম্পট দেব নাকি দাড়ি-ফাড়ি নিয়ে ? সোজা চলে যাব বাড়িতে ? দধীচির সীনে যখন দেখবে আমি বেমালুম হাওয়া—তখন টের পাবে মজাটা কাকে বলে ! উঁহু—তাতে সুবিধে হবে না। তারপর কাল সকালে আমাকে বাঁচায় কে ? পটলডাঙার বিখ্যাত টেনিদার বিখ্যাত চাঁটিতে স্রেফ পটল তুলে বসতে হবে।

না—না, ওসব নয়। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। এমন জব্দ করে দেব যে কিল খেয়ে কিলটি সোনা মুখ করে গিলে নিতে হবে। টেনিদার বত্রিশ পাটি দাঁতের সঙ্গে আর একটি দাঁত গজিয়ে দেব—যার নাম আক্কেল-দাঁত। আর সেইসঙ্গে টেনিদার ধামাধরা ওই স্টেজ-ম্যানেজার শ্রীমান হাবুল সেনকেও টেরটি পাইয়ে দিতে হচ্ছে !

ভগবানকে ডেকে বললাম, প্রভু, আলো দাও—এ অন্ধকারে পথ দেখাও। এবং প্রভু আলো দিলেন।

হাবুলকে বললাম, ভাই, পাঁচ মিনিটের জন্যে একটু বাড়ি থেকে আসছি।

হাবুল আঁতকে বললে, কেন ?

—এই, পেটটা একটু কেমন কেমন—

হাবুল বললে, সেরেছে ! যত সব পেটরোগা নিয়ে কারবার—শেষটায় ডেবাবে বোধ হচ্ছে! একটু পরেই যে তোর পার্ট রে !

আমি বললাম, না, এক্ষুনি আসছি।

মনে মনে বললাম, পেট কার কেমন একটু পরেই দেখা যাবে এখন। মনুমেণ্ট খাইয়ে পার্ট করাতে চাও—দেখি আরো কত গুরুপাক জিনিস হজম করতে পারো !

ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরলাম। ডাক্তার ছোট-কাকার ওষুধের আলমারিটা হাতড়াতে বেশি সময় লাগে নি—একেবারে মোক্ষম ওষুধ নিয়ে এসেছি। হিসেব করে দেখেছি আমার পার্ট আসতে আরো প্রায় ঘণ্টা-খানেক দেরি—এর মধ্যেই কাজ হয়ে যাবে।

চায়ের বড় কেটলিটা যেখানে উনানের ওপর ফুটছে, সেখানে গেলাম। তখন কেটলির দিকে কারো মন নেই, সবাই উইংসে ঝুঁকে পড়ে প্লে দেখছে। টেনিদা লাফাচ্ছে ভীমসেনের মতো—আর সে কী ঘন-ঘন ক্ল্যাপ ! দাঁড়াও দাঁড়াও—কত ক্ল্যাপ চাও দেখব !

পিরামিডের মতো নাক উঁচু করে বিজয়-গৌরবে ফিরে এল টেনিদা। একগাল হাসি ছড়িয়ে বললে, কেমন পার্ট হল রে হাবুল ?

হাবুল কৃতার্থভাবে বললে, চমৎকার, চমৎকার! তুমি ছাড়া এমন পার্ট আর কে করতে পারত? অডিয়েন্স বলছে, সাবাস সাবাস!

অডিয়েন্স কেন সাবাস্ সাবাস্ বলছে আমি জানি। তারা বুঝতেই পারে নি যে ওটা ভীমের না বিশ্বকর্মার পার্ট। কিন্তু আসল পার্ট আর একটুখানি দেরি আছে—আমি মনে মনে বললাম।

স্টেজ কাঁপিয়ে টেনিদা হুঙ্কার ছাড়লে, চা—ওরে চা আন্—

হাবুল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

আবার ড্রপ উঠেছে। দধীচির ভূমিকায় আমি ধ্যানস্থ হয়ে বসে পোকা খাচ্ছি। শিষ্য দধিমুখ এবার দূরে দাঁড়িয়ে আছে—আগের অভিজ্ঞতাটা ভোলে নি।

বিশ্বকর্মা আর ইন্দ্রের প্রবেশ। টেনিদা আর হাবুল।

হাবুল বললে, প্রভু, গুরুদেব,
আসিয়াছি শিবের আদেশে।
তব অস্থি দিয়া
যেই বজ্র হইবে নির্মাণ—

টেনিদা বললে, দেখাইব বিশ্বকর্মা-যশ।
হেন অস্ত্র তুলিব গড়িয়া,
দীপ্ততেজে দগ্ধ হবে স্থাবর-জঙ্গম,—

তারপরেই স্বগতোক্তি করলে, উঃ, জোর কামড় মেরেছে পেটে মাইরি!

হাবুল চাপা গলায় বললে, আমারও পেটটা যেন কেমন গোলাচ্ছে রে!

অড়েচোখে আমি একবার তাকিয়ে দেখলাম মাত্র। মনুমেণ্ট খেয়ে হজম করতে পারো, দেখিই না হজমের জোর কত!

আমি বললাম, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ—

আগে করি ইষ্ট-নাম ধ্যান—
ধ্যান-ভঙ্গ যতক্ষণ নাহি হয়,
চুপচাপ থাকো ততক্ষণ!
তারপরে তনুত্যাগ করিব নিশ্চয়।

আমি ধ্যানে লসলাম। সহজে এ ধ্যান ভাঙছে না। পোকার উপদ্রব লেগেই আছে—তা থাক। আমি কষ্ট না করলে টেনিদা আর হাবুলের কেষ্ট মিলবে না। গরম চায়ের সঙ্গে কড়া পার্গেটিভ—এখনই কী হয়েছে!

টেনিদা মুখ বাঁকা করলে, শীগগির ধ্যান শেষ কর্ মাইরি! জোর পেট কামড়াচ্ছে রে!

আমি বললাম, চুপ! ধ্যান-ভঙ্গ করিও না,
ব্রহ্মশাপ লাগিবে তাহলে—

ধ্যান কী সত্যি-সত্যিই করছি নাকি? আরে ধ্যাৎ! আমি আড়চোখে দেখছি, টেনিদার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে মেরে গেছে।

হাবুলের অবস্থাও তথৈবচ। ভগবান করুণাময়!

টেনিদা কাতর স্বরে বললে, ওরে প্যালা, গেলাম যে! দোহাই তোর, গিগগির ধ্যান শেষ কর্—তোর পায়ে পড়ছি প্যালা—

হাবুল বললে, ওরে আমার যে প্রাণ যায়—

আমি একেবারে নট্-নড়ন-চড়ন। সামলাও এখন! মুনি-ঋষির ধ্যান—দেহত্যাগের ব্যাপার—এ কি সহজে ভাঙবার জিনিস!

—বাপ্স্ গেলাম—এক লম্ফে টেনিদা অদৃশ্য। একেবারে সোজা অন্ধকার আমতলার দিকে। পেছনে পেছনে হাবুল।

আর থিয়েটার?

সে কথা বলে কী হবে!

সমাপ্ত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

—এই লেখকের—

চারমূর্তি	৩.০০
চারমূর্তির অভিযান	২.৫০
কিশোর সঞ্চয়ন	৪.০০
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প	২.০০
রাঘবের জয়যাত্রা	২.৫০
কম্বল নিরুদ্দেশ	২.৫০
চারমূর্তি (নাটক)	১.৭৫